পিতামহের অগ্রজ রাজা রামচন্দ্র ও পিতামহের বৈমাত্রেয় রাজা রামকৃষ্ণ এই তিন জন নির্দ্ধারিত রাজস্ব না দেওয়াতে কুড়ি লক্ষ টাকা দেনা হয়। ইহার মধ্যে তাঁহার পিতা ও পিতামহ দশলক্ষ টাকা পরিশোধ করেন। এই দশ লক্ষ টাকা এবং নব নিযুক্ত নবাব আলিবর্দ্দীর প্রার্থিত নজরাণা বার লক্ষ টাকা নিয়মকাল মধ্যে পরিশোধ করিতে না পারায় তাঁহাকে মুরশিদাবাদে নজরবন্দী থাকিতে হয়। এই নজরবন্দী অবস্থাতে মহারাজা মুরশিদাবাদে নিজের বাসাবাটীতে থাকিয়া সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার সুদক্ষ দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্র সর্ব্বদা মুরশিদাবাদে আসিয়া তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন। এই প্রভুভক্ত দেওয়ানের কর্ম্ম-

---

লিখি দিলা সেই রাজা দিব বার লক্ষ।
সাজোয়াল হইল সুজন সর্ব্ব ভক্ষ॥
বর্গীতে লুটিল কত কতবা সুজন।
নানা মতে রাজার প্রজার গেল ধন॥
বদ্ধ করি রাখিলেক মুর্শিদাবাদে।
কত শত্রু কত মতে লাগিল বিবাদে॥

অন্নদামঙ্গল গ্রন্থ সূচনা।

দ্রষ্টব্য মহাতব জঙ্গ আলিবর্দ্দীরই আর একটী নাম।

ঐ গ্রন্থের অন্যস্থলে পুনরায় লিখিয়াছেন,—

"আলিবর্দ্দী কৃষ্ণচন্দ্রে ধরি লয়ে যাবে।
নজরাণা বলি বার লক্ষ টাকা চাবে॥
বদ্ধ করি রাখিবেক মুরশিদাবাদে।
মোরে স্তুতি করিবেক পড়িয়া প্রমাদে॥"

অন্নদামঙ্গল রাজার অন্নদার সহিত কথা।

কুশলতায় নজরাণার টাকা পরিশোধ হইলে তিনি কারামুক্ত হন, কিন্তু উক্ত কারণে দেওয়ানজীকে অনেকের বিদ্বেষভাজন হইতে হয় এমন কি রাজকুমারগণ ও রাজজামতাগণ পর্য্যন্ত তাহার উপর কুপিত হন। তৎকালে রাজপুত্র রাজজামাতা ও ভাগিনেয়গণ জমীদারীর অনেক অংশ ইজারা রাখিতেন এবং স্বেচ্ছামত কর প্রদান করিতেন। বাকী করের নিমিত্ত তাহাদের উপর তেমন তাগীৎ না হওয়ায় বিস্তর খাজনা বাকী পড়িয়া থাকিত। রঘুনন্দন প্রভুকে কারামুক্ত করিবার নিমিত্ত কঠোর হস্তে এই সমুদায় বাকী কর আদায় করেন। কথিত আছে এজন্য তিনি রাজজামতাকে সাধারণ প্রজার ন্যায় পদাতিক পাঠাইয়া ধরিয়া আনিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। তাহার এই কঠোর ভাব দর্শন করিয়া রাজকুমার প্রভৃতি সকলেই স্বীয় স্বীয় কর অচিরে পরিশোধ করেন।

এই সময়েই দেওয়ান রঘুনন্দন নদীয়া রাজ্য জরিপ করেন। এবং ভূমির উর্ব্বরতার তারতম্যানুসারে যথোচিত কর নির্দ্ধারণ করেন এবং রাজদত্ত নিষ্করভোগীগণকে মুক্তিপত্র দেন। এই ছাড় "রঘুনন্দনী ছাড়" বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই পরিমাণ সংক্রান্ত কার্য্য সমাপ্ত হইলে রাজা একদিন তাঁহাকে যথোচিত প্রশংসা করিয়া বলেন যে জরীপের কার্য্যটী অতি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। তাহাতে রঘুনন্দন উত্তর করেন যে একার্য্য সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইবার নহে "যদি রসির একপ্রান্ত ঠাকুর স্বয়ং এবং অপর প্রান্ত ঠাকুর পুত্রদের মধ্যে কেহ ধরিতেন আর মেরক চিঠা লিখিত তাহা হইলেও জরীপ সূক্ষ্ম হইতে পারিত কি না সন্দেহ।"

রঘুনন্দন কেবল আয়ের বৃদ্ধি করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই ব্যয়েরও অনেক লাঘব করিয়াছিলেন, একারণ তিনি রাজসংসারে সকলেরই অপ্রিয় হইয়া পড়েন। দেওয়ান রঘুনন্দন সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে কোন সময়ে মুরশিদাবাদ দরবার গৃহে প্রবেশকালে সভা প্রবেশের

পথ অতি সঙ্কীর্ণবিধায় নদীয়ারাজের দেওয়ানের পরিচ্ছদের প্রান্তদেশ বর্দ্ধমানাধিপতির দেওয়ান মাণিকচাঁদের অঙ্গ স্পর্শ করায় ক্রুদ্ধ হইয়া মাণিকচাঁদ রঘুনন্দনকে হিন্দি ভাষায় "দেখ্‌তে নেহি পাজী" বলায় রঘুনন্দন প্রত্যুত্তরে বলেন "নকর সবকই পাজী হায় কোই ছোটা কোই বড়া" এই সমুচিত উত্তর প্রদান করেন। সেই অবধি মাণিকচাঁদ রঘুনন্দনের ভয়ানক শত্রু হইয়া দাঁড়ান এবং পরে বুদ্ধিবলে বর্দ্ধমান রাজ-সংসার হইতে মুরশিদাবাদের নবাবের দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হইয়া রঘুনন্দনের সর্ব্বনাশ করিবার পন্থা খুঁজিতে থাকেন। এই সময়ে হুগলী হইতে কয়েক লক্ষ মুদ্রা রাজস্ব হিসাবে মুরশিদাবাদ সরকারে প্রেরিত হয়, কিন্তু পথে নদীয়ান্তর্গত পলাশীতে দস্যুগণ কর্ত্তৃক উহা অপহৃত হইলে বহু অনুসন্ধানেও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কর্ম্মচারীগণ তাহার উদ্ধার সাধন করিতে না পারায় রঘু-নন্দনের দোষেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছে বলিয়া মাণিকচন্দ্রের ষড়যন্ত্রে রঘু-নন্দনকে প্রথমে গর্দ্দভ পৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করাইয়া পরে তোপমুখে উড়াইয়া দেওয়া হয়। কথিত আছে, যখন মুরশিদাবাদে রঘুনন্দনকে গর্দ্দভ পৃষ্ঠে আরোহিত করাইয়া নবাবের লোকেরা নগর ভ্রমণ করায় তখন তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের বাসার সম্মুখবর্ত্তী হইলে রাজকুমার শিবচন্দ্র তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া হাস্য করিলে তিনি বলেন "মূর্খ রাজনন্দন আমার এই অব-মাননাতে কাহার অবমাননা হইতেছে তাহা বুঝিলে না এই বড় দুঃখ। আমি গর্দ্দভে আরোহণ করি নাই, তোমার পিতাই করিয়াছেন জানিবে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাসী এই দেওয়ানের এই বীভৎস পরিণামে মর্ম্মাহত হইয়া রঘুনন্দনের বংশাবলীকে পলাশী পরগণায় চৌদ্দ শত বিঘা মহোত্রান জমি প্রদান করেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে রঘুনন্দনের চেষ্টায় নজরাণার টাকা পরিশোধ করিয়া বাকী রাজস্বের বন্দোবস্ত করিয়া রাজা কারামুক্ত হয়েন, কিন্তু

মারহাট্টা বিভ্রাট শেষ হইলেও বাকী রাজস্ব পরিশোধ করিতে না পারায় তিনি পুনরায় কারারুদ্ধ হন। এই ব্যাপার রাজসংসারে বিশলাখী দায় বলিয়া প্রসিদ্ধ। এবার নবাব আলিবর্দ্দী স্বচক্ষে তাঁহার জমীদারীর দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে পিতৃপিতামহের ঋণ হইতে মুক্তি দেন। কথিত আছে চতুর চূড়ামণি কৃষ্ণচন্দ্র কৌশলে জলবিহারী নবাবকে নদীয়ার জলমগ্ন ভূভাগ সকল বিশেষতঃ নবদ্বীপের বংশাচ্ছাদিত জলাভূমির ও কলিকাতার সন্নিহিত বাদার জলমগ্ন স্থান সকলের দুরবস্থা দেখাইয়া সে যাত্রা অব্যাহতি লাভ করেন। এ সম্বন্ধে এতদঞ্চলে আর একটি মনোহর অদ্ভুত কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে।

কথিত আছে বাকী রাজস্ব পরিশোধের নিমিত্ত রাজা মুরশিদাবাদে গমন করিলে তাঁহার কয়েকজন প্রিয় পার্শ্বদ তাঁহার সঙ্গে যান। গর্গ-গোত্রীয় বরাহ মিহির তুল্য সুপণ্ডিত সাধকপ্রবর রামরুদ্র বিদ্যানিধি রাজার পার্শ্বচরগণের অন্যতম ছিলেন। প্রতিদিনই মহারাজকে পরিষদগণসহ নবাবের দরবারে হাজির থাকিতে হইত। নবাব তদানীন্তন বঙ্গের বিশ্ব-বিদ্যালয় নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের রাজা বলিয়া মহারাজকে বিশেষ সম্মান করিতেন এবং প্রায়ই তাঁহার নিকট কোন না কোন হিন্দুশাস্ত্রের কথা উত্থাপন করিয়া শাস্ত্রচর্চ্চা প্রসঙ্গে আনন্দ অনুভব করিতেন। এক দিবস মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পরিষদগণসহ নবাবের দরবারের দরবারে উপস্থিত আছেন এমন সময় নবাব প্রশ্ন করিলেন "আজ কি তিথি?" মহারাজ রামরুদ্র বিদ্যানিধির দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই তিনি বলিলেন "আজ পূর্ণিমা।" নবাবের জানা ছিল পণ্ডিতদের অনেক সময় ভুল হয়, তিনি একটু রহস্য করিবার মানসে জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ সমস্ত রাত্রিই জ্যোৎস্নাময় থাকিবে?" বিদ্যানিধি উত্তর করিলেন, "হাঁ হুজুর, আজ সমস্ত রাত্রিই জ্যোৎস্নাময় থাকিবে।" নবাব হাসিয়া বলিলেন, "পণ্ডিতজী

আপনি মিথ্যা কথা বলিতেছেন।" বিদ্যানিধি একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন "না খোদাবন্দ, আমি ঠিক বলিতেছি।" নবাব একটু রুক্ষভাবে বলিলেন, কেন আপনিই না গণিয়া লিখিয়াছেন, আজ "চন্দ্রগ্রহণ" এখন আবার কেমন করিয়া বলিতেছেন "সমস্ত রাত্রি জ্যোৎস্নাময় থাকিবে?" ঐ সময়ে বঙ্গদেশে একখানি মাত্র পঞ্জিকা গণিত হইত। ঐ পঞ্জিকার গণক উক্ত রামরুদ্র বিদ্যানিধি। তখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, সুতরাং বিদ্যানিধি মহাশয় স্বয়ং পঞ্জিকা স্বহস্তে লিখিতেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একখানি পঞ্জিকা নবাব সরকারে ও বঙ্গের বিশেষ বিশেষ রাজা জমিদার ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের নিকট কয়েকখানি পঞ্জিকা প্রেরণ করিতেন। ঐ সময় রঘুনন্দনের স্মৃতির অপেক্ষাও অপ্রতিহত প্রভাবে এই পঞ্জিকার ব্যবস্থা বঙ্গের সর্ব্বত্র গৃহীত হইত। নবাবের কথায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্মরণ হইল যে সে দিবস চন্দ্রগ্রহণ। পূর্ব্বদিবসেই গ্রহণকালে কর্ত্তব্য বৈধ কার্য্যাদির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। ভাবিলেন, কি দুর্ভাগ্য! নিতান্ত গ্রহবৈগুণ্য বশতঃই রামরুদ্র বিদ্যানিধির নবাবের সম্মুখে এই দুর্দ্দশা ঘটিল। মহারাজ লজ্জায় আর মাথা তুলিতে পারিলেন না। রামরুদ্র বিদ্যানিধি একটু চিন্তা করিয়াই সপ্রতিভভাবে বলিলেন "আজ চন্দ্রগ্রহণ দেখিতে পাইবেন না। আজ সমস্ত রাত্রি জ্যোৎস্নাময় থাকিবে। নবাব তখনি পঞ্জিকা আনাইয়া ঐ দিনের টিপ্পনীতে অঙ্গুলি সংযোগ পূর্ব্বক বলিলেন, "সর্ব্বগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ" এ কথাটি কাহার হাতের লেখা?" আমি লিখিয়াছি বটে, কিন্তু ঐ "গ্রহণ আজ দেখা যাইবে না।" নবাব বলিলেন, যদি দেখা না যায়, তাহা হইলে পুরস্কৃত করিব কিন্তু যদি দেখা যায়?" বিদ্যানিধি বলিলেন, "আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন।" এমন সময় দরবার ভঙ্গ হইল। মহারাজ বাসায় আসিয়া বলিলেন, "বিদ্যানিধি! করিলে কি?" নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের রাজা বলিয়া নবাবের

নিকট যে প্রতিপত্তিটুকু ছিল, আজ হইতে সে সমুদায়ই নষ্ট হইল, এখন উপায় ? আগামী কল্য তোমার কি দশা হইবে, এবং কি প্রকারেই বা আমি নবাবের দরবারে মুখ দেখাইব।" বিদ্যানিধি বলিলেন, "মহারাজ ! চিন্তা করিবেন না, গ্রহণ হইবে না।" মহারাজ বলিলেন "সর্ব্বগ্রাস গ্রহণও কি কখনও না হইয়া যায় ? তুমি একি প্রলাপ বকিতেছ, এক বৎসর মাথা ঘামাইয়া যাহা স্থির করিয়াছ এক কথায় বলিলে তাহা হইবে না ?"

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় দুশ্চিন্তায় অভিভূত, তিনি তখন স্নানে যাইবার জন্ম প্রস্তুত হইলেন। রামরুদ্র বিদ্যানিধি মহারাজকে বলিলেন "মহারাজ আপনি নিশ্চিন্ত মনে স্নানাদি করুন। আমার একটী নিবেদন অদ্য দিবারাত্রির মধ্যে আর আমাকে খোঁজ করিবেন না। আগামী কল্য প্রত্যুষে আসিয়া আমি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিব।" মহারাজ বলিলেন "বুঝিয়াছি তুমি পলাইবে, কিন্তু পলায়ন বৃথা, বাদসার মুল্লুক ছাড়িয়া কোথায় যাইবে ? যেখানে যাইবে, সেখানেই ধরা পড়িবে।" বিদ্যানিধি বলিলেন "মহারাজ প্রাণের মায়া কি এতই অধিক যে মহারাজকে ছাড়িয়া নিজের ধিক্কৃত প্রাণ লইয়া পলায়ন করিব ?" মহারাজ বিদ্যানিধির তেজস্বীতাপূর্ণ স্বভাব অবগত ছিলেন, আর কিছু বলিলেন না কিন্তু নানা সন্দেহ ও কল্পনায় তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া রহিল। এদিকে বিদ্যানিধি মহারাজের কর্ম্মচারীদের দ্বারা একশত আটটী লোহিত বর্ণ জবাকুসুম সংগ্রহ করিলেন এবং একটী তামার ক্ষুদ্র কলস, একখানি তাম্র থাল ও অন্যান্য পূজোপকরণ লইয়া গঙ্গাগর্ভে অবতরণ করিলেন। তাহার পর জলের ধার দিয়া বরাবর উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। যতদূর দেখা গেল মহারাজের লোকেরা তাকাইয়া রহিল ; তাহার পর ফিরিয়া গিয়া মহারাজকে সংবাদ দিল। মহারাজ কোন কথাই বলিলেন না। বিদ্যানিধি সহর অতিক্রম করিয়া বহদূরে গঙ্গা-

গর্ভস্থ এক নির্জ্জন স্থানে পূজার দ্রব্য রাখিয়া স্নান করিলেন। তাহার পর সন্ধ্যা শেষ করিয়া একশত আটটী জবাকুসুম দ্বারা যথাবিধি স্বীয় লৌকিক উপাস্যদেব ভগবান সহস্রাংশুর অর্চ্চনা করিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্-কালেই তাম্র কলসটী যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া মন্ত্রবলে রাহুকে আকর্ষণ পূর্ব্বক ঐ কলসের মধ্যে প্রবেশ করাইলেন। তাহার পর উহার উপরিভাগে তাম্র থালাখানি পাঁচটী শিবলিঙ্গ তদুপরি স্থাপন পূর্ব্বক পূজা শেষ করিয়া একাগ্রমনে জপ আরম্ভ করিলেন। রজনী সমাগত হইল জ্যোৎস্নায় চতুর্দ্দিক *পুলকিত। প্রাসাদের উপরি-ভাগে ছাদে নবাব ও তাঁহার পারিষদগণের জন্য আসন স্থাপিত হইল। সপারিষদ নবাব উৎসুকচিত্তে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। নক্ষত্রমালা পরিশোভিত পূর্ণ শশধর নবাবের উৎকণ্ঠা দেখিয়া যেন দূর হইতে হাস্য করিতে লাগিলেন। প্রহরে প্রহরে ঘড়ি বাজিতে লাগিল। যখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত তখনও আকাশ নির্ম্মল, সামান্য একখণ্ড মেঘ পর্য্যন্ত আকাশে নাই। পূর্ণ শশধরের •অনন্ত জ্যোৎস্নারাশিতে জগৎ উদ্ভাসিত। নবাবের চক্ষু নিদ্রার আকর্ষণে ঢুলু ঢুলু করিতেছে আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না বলিলেন—নদীয়ার রাজার পণ্ডিতটা একটা বুজরুক, কেন না আমি মৌলবী সাহেবের পত্রেও জানিতে পারিয়াছি দিল্লীর পঞ্জিকায় লেখা আছে, রাত্রি ৪ দণ্ডের সময় গ্রহণ লাগিবে, ও ২য় প্রহর সময় ছাড়িবে এবং পূর্ণগ্রাস হইবে।" সেই গ্রহণ হইল না, আর বসিয়া থাকিয়া কি হইবে, চল আমরা শুইতে যাই। নবাব শয়ন করিতে গেলেন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের হৃদয় আনন্দে পুলকিত। তাঁহার এত আনন্দ হইয়াছে যে বিনিদ্র অবস্থায়ই তিনি রাত্রি কাটাইলেন। এদিকে জনপ্রাণীবিহীন গঙ্গাগর্ভে মাঘমাসের দারুণ হিমপাতেও অটল দেহে রামরুদ্র বিদ্যানিধি নাসাগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে-

ছেন। আর রাত্রি নাই রজনীর বিচ্ছেদ স্মরণ করিয়া নিশানাথের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিল। ক্ষীণজ্যোতি নক্ষত্র সকলও ক্রমে ক্রমে কোন্ অজানা প্রদেশে লুকাইতে লাগিল। বিদ্যানিধি জপ শেষ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি শিব পাঁচটী গঙ্গাস্রোতে বিসর্জ্জন করিয়া তাম্রধারটী তুলিলেই সেই প্রভাতকালে পৃথিবী যেন ধূসর বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইল। নবাব সহ্যাত্যাগ করিয়া দেখিলেন গ্রস্তাস্ত চন্দ্রের ছায়া আকাশ পটে বিলীন হইতেছে।

যখন বিদ্যানিধি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বাসায় আগমন করিলেন, তখন মহারাজ হাত বাড়াইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন "বিদ্যানিধি তুমি আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছ, আজ আমি যথার্থ নবদ্বীপের পণ্ডিতের রাজা।" যথাসময়ে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সপারিষদ নবাবের দরবারে উপস্থিত হইলেন। সেদিন নবাবের দরবারে সমস্ত রাজা, জমিদার, আমির ওমরাহের দৃষ্টি রাজা ও বিদ্যানিধির দিকে পড়িল। সকলেই বিদ্যানিধিকে দেখিবার জন্য উৎসুক। বিদ্যানিধি গৌরাঙ্গ দেহ তেজঃ-পুঞ্জ কলেবর গরদের ধুতি ও উত্তরীয় দ্বারা দেহ আবৃত করিয়া মহারাজের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। নবাব জ্যোতিঃ শাস্ত্র ও যোগ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলেন এবং বিদ্যানিধির উত্তরে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তাহার পর প্রকাশ্য দরবারে বিদ্যানিধির প্রশংসা করিয়া পুরস্কার প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলেন। বিদ্যানিধি বলিলেন "খোদাবন্দ! মহারাজের অভীষ্টের সহিত আমার অভীষ্টের কোনই পার্থক্য নাই। অতএব মহা-রাজকে সন্তুষ্ট করিলেই আমি পরম সন্তোষলাভ করিব।" প্রভুর প্রতি এইরূপ অকৃত্রিম প্রীতি দেখিয়া নবাব অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলেন এবং বাকী রাজস্ব রেহাই দিয়া সে যাত্রায় মহারাজকে সসম্মানে বিদায় দিলেন। এই সকল কিম্বদন্তীর মধ্যে কতটুকু সত্য নিহিত আছে বলা যায় না

তবে আলিবর্দ্দীর সহিত কৃষ্ণচন্দ্রের যে বিশেষ সদ্ভাব স্থাপিত হইয়াছিল তাহার বহুপ্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শুনা যায় কৃষ্ণচন্দ্রের নানাবিধ সদ্‌গুণে মোহিত হইয়া নবাব তাঁহাকে সর্ব্বদাই নিকটে রাখিতে চেষ্টা পাইতেন এবং মুরশিদাবাদে অবস্থান কালে প্রায় প্রতি রজনীর প্রথম ভাগে নবাবের সমীপে থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে উর্দ্দ্‌ ভাষায় মহাভারত প্রভৃতি পুরাণের অনুবাদ করিয়া শুনাইতেন। তিনি এই সময়ে আলিবর্দ্দীর এত অধিক প্রিয় পাত্র হইয়াছিলেন যে নবাব তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কার্য্যই করিতেন না। কিন্তু তাঁহার এই সৌহৃদ্য বেশীদিন ভোগ করিতে হয় নাই। নিষ্ঠুর কাল এই সময়ে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সহৃদয় নবাব আলিবর্দ্দীকে কুক্ষিগত করিলে তাঁহার দৌহিত্র স্বনাম প্রসিদ্ধ সিরাজদ্দৌলা বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরোহন করেন। ইতিহাসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, নবীন নবাব নানাকারণে তাৎকালীন রাজ্যস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের সহিত ও তাঁহার কতিপয় প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত সদ্ভাব রাখিতে সক্ষম হয়েন নাই; সুতরাং তাঁহাদের সকলেরই তাঁহার প্রতি বিরাগ জন্মিয়াছিল, এবং কিসে তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ হয় সকলেই তাহার পন্থা অনুসন্ধান করিতেছিলেন। ইহাঁদের দুই চারিজন একত্র হইলেই এ বিষয়ে গোপন পরামর্শ হইতে। এক্ষণে দৈবক্রমে তাঁহাদের মনোভিলাষ সিদ্ধ হওয়ার এক সুযোগ উপস্থিত হইল। ঢাকার শাসনকর্ত্তা রাজা রাজবল্লভের পরিষদবর্গকে আশ্রয় দেওয়া উপলক্ষে ও অন্যান্য নানা কারণে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত নবীন নবাবের বিবাদ বাধিয়া উঠিল।* এই সুযোগ অবলম্বন করিয়া নবাবের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীগণ

* Vide Life of Lord Clive (1836) Vol. I, P. 147 and Orme's History of the Military Transactons of the British Nation. Vol. II, P. 49.

ইংরাজগণের সহায়তায় নবাবকে পদচ্যুত করিয়া মীরজাফরকে সিংহাসন দেওয়াইবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কথিত আছে জগৎশেঠের মুরশিদাবাদ ভবনে এই গোপন সভার অধিবেশন হয়। প্রবাদ এই সময়ে নদীয়াধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পরিজন ও ভৃত্যবর্গ লইয়া শিবনিবাসে বাস করিতেছিলেন। নবাব সিরাজের বিপক্ষে ষড়যন্ত্রকারী মীরজাফর, জগৎ-শেঠ, রাজা মহেন্দ্র (দুর্লভ রায়) রাজা রামনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ, রাজা কৃষ্ণদাস প্রমুখ ব্যক্তিগণ বহু তর্কবিতর্ক করিয়াও কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া নদীয়াধিপতিকে তাঁহাদের সহিত যোগ দিয়া সৎপরামর্শ দিবার জন্য এক পত্রিকা প্রেরণ করিয়া মুর্শিদাবাদে আহ্বান করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পত্রিকার্থ অবগত হইয়া এককালে হর্ষ ও বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন। এই পত্রে নবাবকে পদচ্যুত করিবার কথা লেখা ছিল। রাজা সেই দিন নিশীথ সময়ে এক নিভৃত স্থানে স্বীয় মন্ত্রী কালীপ্রসাদ সিংহ ও অন্যান্য বিশ্বস্ত অমাত্যবর্গকে আহ্বান করিয়া পত্র পাঠ পূর্ব্বক তাঁহাদের পরামর্শ চাহিলেন।

পত্রার্থ প্রবাদানুযায়ী এইরূপ*—

---

* সিরাজের বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত হয় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাহাতে কোন অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না স্থির নিশ্চয় বলা যায় না। আজ পর্য্যন্ত ইংরাজ দপ্তরের তাৎকালীক যে সমস্ত কাগজপত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কোথাও ইহার উল্লেখ নাই। তবে এদেশে একথা সার্ব্বজনীন প্রবাদবাক্য এইমাত্র। লণ্ডন মহানগর হইতে ১৮১১ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত রাজীবচরণ মুখোপাধ্যায় বঙ্গভাষায় বিরচিত "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং" নামক বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত পুস্তক সর্ব্বপ্রথম আমরা উক্ত প্রবাদ পুস্তকস্থ দেখিতে পাই তৎপরে কার্ত্তিকচন্দ্র রায়ের সঙ্কলিত "ক্ষিতিশ

"নবাবের অত্যাচারে মুর্শিদাবাদের লোক সকল স্ব স্ব ঘরদ্বার ত্যাগ করিয়া পলাইতে উদ্যত। নবাব কাহারও কোন কথা শুনেন না। এ বিষয়ে কি করা কর্ত্তব্য আমরা বুঝিতে না পারিয়া আপনাকে আহ্বান করিতেছি, আপনি শীঘ্র আসিবেন।" সুচতুর কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদের আহ্বানে

বংশাবলী চরিত" নামক নদীয়া রাজবংশের ইতিহাসে ইহা মুদ্রাঙ্কিত দেখি এবং কার্ত্তিকেয় বাবু নানারূপ যুক্তি দ্বারা এই প্রবাদ বাক্যের যথার্থতা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান দেখিতে পাই। অন্যান্য বহু যুক্তির মধ্যে তিনি লিখিয়াছেন "আমরা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমকালীন লোকের এবং ঐ রাজবংশোদ্ভব রাজাদিগের নিকট শুনিয়াছি, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই রাজ-বিপ্লবের প্রবর্ত্তক মন্ত্রী ও প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তিনি এই বিষয়ে বিশেষ যত্নবান ও উদ্যোগী ছিলেন বলিয়া, এ প্রদেশস্থ প্রাচীন লোকেরা তাঁহাকে নেমকহারাম কহিত, অর্থাৎ যে জাতির অনুগ্রহে তাহার বংশের এইরূপ আধিপত্য ও গৌরব বৃদ্ধি হয়, সে জাতির অধঃপাত সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহাদের অভিপ্রায়ে নিতান্ত কৃতঘ্নতার কার্য্য হইয়াছিল। এমন কি, যখন ইংরেজদের রাজত্বকালে রাজস্বসংগ্রহের নিয়মানুসারে, তাঁহার পরপুরুষের জমিদারী নিলাম হইতে আরম্ভ হইল তখন এতদিনে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কৃতঘ্নতার ফল ফলিল, এই কথা এ প্রদেশস্থ যাবতীয় লোকের মুখে শুনা গিয়াছিল। বিশেষতঃ যখন ইংরেজদিগের সহিত নবাব মীরকাসিমের বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা হয়, তখন নবাব কৃষ্ণচন্দ্রকে ইংরেজদের পক্ষের লোক জানিয়া তাঁহাকে ও তদীয় পুত্রকে মুঙ্গেরের দুর্গে কারারুদ্ধ করেন; ও পরে তাঁহাদের প্রাণ সংহার করিতে আদেশ দেন। ইহার বৃত্তান্ত যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

ইতিহাসের একটী প্রধান মূল জনশ্রুতি। যদি এস্থানে ঐ জনশ্রুতি

প্রথমে স্বয়ং না যাইয়া নিজ বিশ্বস্ত দেওয়ান কালীপ্রসাদকে তাঁহাদের উদ্দেশ্য অবগত হইবার জন্য মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করেন। পরে তাঁহার

এককালে অগ্রাহ্য করিয়া যুক্তিমাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক সত্যাসত্য স্থির করা যায়, তাহা হইলেও হিন্দুজাতির উপরোক্ত সংস্কার ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। নবাব কেবল জগৎশেঠ, উমিচাঁদ ও খোজাবাজীদ এই এই কয়েকজন শ্রেষ্ঠীর উপর অত্যাচার করেন এমন নহে; তিনি ভূম্যধিকারিগণের উপরেও যৎপরোনাস্তি দৌরাত্ম্য করিয়াছিলেন। রাজ-বাটীতে প্রবাদ আছে যে, এমন কি কৃষ্ণচন্দ্র, এক সময়ে নবাবের অত্যাচার আর সহ্য করিতে না পারিয়া জমীদারী পর্য্যন্ত এস্তফা করিয়াছিলেন। তৎ-কালে এ প্রদেশস্থ ভূম্যাধিকারীদের মধ্যে এই রাজার সদৃশ বিচক্ষণ ও উদ্যোগী দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহ ছিল না, এ কথা বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। তাঁহার জমীদারী মুর্শিদাবাদ হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অতএব ঈদৃশ সমৃদ্ধিশালী ও বুদ্ধিসম্পন্ন ভূম্যধিকারী হইয়া, নবাবের দুর্বিসহ দৌরাত্ম্য নিবারণের চেষ্টা না পাইয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিলেন, ইহা কোন ক্রমে সম্ভাবিত বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার জমিদারীর প্রায় মধ্যস্থলে ইংরেজরা বাস করিতেন। সুতরাং, তাঁহাদের চরিত্রাদি তাঁহার যেরূপ জানিবার সম্ভাবনা ছিল তদপেক্ষা জগৎশেঠ বা উমিচাঁদ প্রভৃতি বণিকদের অধিক জানিবার সম্ভাবনা থাকা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। অতএব ইংরেজদিগের সাহায্য ব্যতিরেকে কদাচ কর্ম্ম সিদ্ধ হইবে না। ইহা নবদ্বীপের রাজা কর্ত্তৃক উত্থাপিত হওয়াই নিতান্ত সম্ভাবিত।"

পরবর্ত্তী ইতিহাসবেত্তারাও ক্ষিতীশবংশাবলী দৃষ্টে এই প্রবাদের কথা নিজ নিজ পুস্তকে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; নবাবী আমলের বাঙ্গলার

বাচনিক সমস্ত জ্ঞাত হইয়া স্বয়ং মুরশিদাবাদ যাত্রা করেন। পুনর্ব্বার জগৎশেঠের বাটীতে মন্ত্রণা সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় কেহ কেহ

ইতিহাসলেখক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুস্তকের ২৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "জমীদারগণের মধ্যে বাকী কর আদায়ের জন্য উৎপীড়িত কৃষ্ণচন্দ্রের এই ষড়যন্ত্রে যোগ দেওয়ায় প্রবাদ রহিয়াছে (১)" এই অংশের পাদটীকায় তিনি লিখিয়াছেন "(১) ক্ষিতীশবংশাবলী। রাণীভবানীর এই ষড়যন্ত্রে যোগদান বা প্রতিকূল মত প্রকাশ প্রবাদমাত্র।" বন্ধুবর নিখিল বাবু তাঁহার জগৎশেঠ পুস্তকে ১৪২ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বোক্ত "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র চরিত" ও "ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—"রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এইরূপ কাপুরুষজনিত শুভমন্ত্রণায় যোগদানের জন্য রাণীভবানী তাঁহাকে সদুপদেশ দানের ছলে "শাঁখা সিন্দূর" উপহার পাঠাইয়াছিলেন বলিয়াও প্রবাদ প্রচলিত আছে। ইতিহাসে কিন্তু এ মন্ত্রণা সভার উল্লেখ দেখা যায় না এবং কোন কোন ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ব্যাপারে জমিদারদিগের বিশেষ কোনও সংস্রব না থাকার জন্য রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির ষড়যন্ত্রে যোগদানের কথা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। কিন্তু আমরা তাঁহাদের সহিত একমত নহি। প্রবাদ এই মন্ত্রণা সভার সৃষ্টি করিলেও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি ষড়যন্ত্রকারিদিগের সহিত যোগদান করিয়া যে ইংরাজদিগের সহায়তা করিয়াছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।" সুহৃদ্বর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁহার সিরাজদ্দৌলা গ্রন্থে ৬১৯ পৃষ্ঠায় এই গুপ্ত মন্ত্রণা সভা সম্বন্ধে লিখিতে যাইয়া লিখিয়াছেন "যাঁহাদের সহিত অগণিত প্রকৃতিপুঞ্জের সুখ দুঃখের চিরসংস্রব তাঁহাদের মধ্যে কেবল কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র ভূপ বাহাদুর এই গুপ্তমন্ত্রণায় যোগদান করিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাও শুনিতে পাওয়া যায় যে অর্দ্ধবঙ্গাধিকারিণী

মুসলমানের পরিবর্ত্তে হিন্দুশাসকের প্রস্তাব করেন, কিন্তু তাহাতে দূরদর্শী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র উত্তর করেন, "আমার মতে সেনাপতিকে সহায় করিয়া নববল দৃপ্ত ইংরাজদিগের সহিত যোগ দিয়া বর্ত্তমান নবাবকে পদচ্যুত করা সহজসাধ্য হইবে। বিশেষতঃ ইংরাজগণের সহিত আমার বিশেষ

প্রতিভাশালিনী রাণীভবানী কৃষ্ণনগরাধিপতির কাপুরুষত্বের পরিচয় পাইয়া সঙ্কেতে সদুপদেশ দিবার জন্য "শাঁখা সিন্দুর" উপহার পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র রাজা গিরীশচন্দ্র ১২৪৫ বাং অব্দে মহামান্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বরাবর তাঁহার দরখাস্তে এইরূপ লিখেন, "আমার প্রায় সমস্ত জমিদারী নীলাম হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে কেবল নিষ্কর ভূমির উপসত্বের উপর নির্ভর করিয়া অতি কষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি। যদি তাহার উপর কর স্থাপন করা হয় তবে আমার জীবিকা-নির্ব্বাহের কোন উপায় রহিবে না। আমার পূর্ব্বপুরুষ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এ প্রদেশ আপনাদের অধিকৃত করার বিষয়ে বহুতর যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। অতএব আপনাদের রাজত্বে আমার এতাদৃশ দুর্গতি হওয়া ন্যায় ও বিচার সঙ্গত হয় না ইত্যাদি" এ বিষয়ে সদরবোর্ডের সাহেবেরা ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টকে রাজাকে ১০০০৲ টাকা মাসহারা দিতে ও তাঁহার বিষয়কর্ম্মের বন্দোবস্ত করিতে সম্মত হইয়া যে পত্র দেন তাহাতে এইরূপ লেখেন, "রাজার পূর্ব্বপুরুষ গবর্ণমেণ্টের যতদূর সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা আপাততঃ জানা যাইতেছে না, কিন্তু এই রাজা অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত এবং ইদানীং সাতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত, অতএব ইহাঁর প্রতি গবর্ণমেণ্টের কৃপাবলোকন করা উচিত ইত্যাদি।" লর্ড ক্লাইভ দত্ত কামানগুলি যাহা অদ্যাপি রাজপ্রাসাদে আছে ও তৎকর্ত্তৃক দিল্লী হইতে রাজরাজেন্দ্র উপাধি আনাইয়া দেওয়া ও মীরকাশিম কর্ত্তৃক মুঙ্গেরে অবরুদ্ধ

সম্ভাব আছে, সুতরাং এ বিষয়ে আমি বিশেষ চেষ্টা করিতে পারিব।" পরিশেষে কথঞ্চিৎ বাক্‌বিতণ্ডার পর রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মতই সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হয়। কোন কাগজ পত্রে প্রকাশ না থাকিলেও ইহা বাঙ্গালার জনসাধারণের বিশ্বাস যে স্বয়ং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কালীঘাটে মায়ের পূজা দিবার ছলে কলিকাতায় গমনপূর্ব্বক ইংরাজদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এ বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন। এইরূপে নবাবের নৃশংস হস্ত হইতে প্রজাবর্গের নিষ্কৃতিলাভ ও বাঙ্গালায় কল্যাণকর ইংরাজাধিকার বিস্তার এই উভয় ঘটনাই নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পরিণামদর্শিতার ফল বলিতে হইবে।

এই মন্ত্রণার ফলে পরবর্ত্তী ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়ান্তর্গত পলাশীক্ষেত্রে বাঙ্গালার তথা ভারতবর্ষে মুসলমানের সৌভাগ্যরবি চিরদিনের জন্য অস্ত-মিত হয় এবং দুর্ভাগ্য নবাব সিরাজউদ্দৌলা কিরূপে মীরজাফর পুত্র মীরণ কর্ত্তৃক নৃশংসভাবে নিহত হয়েন তাহা বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। এই নিদারুণ বিয়োগান্ত নাটকের যবনিকা পতিত হইলে লর্ড ক্লাইভ নবাব সেনাপতি মীরজাফরকে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার নবাব বলিয়া অভিবাদন করিলেন। নবাব মীরজাফরের সহিত যে সকল সর্ত্ত স্থাপিত হয় তন্মধ্যে এই যুদ্ধোপলক্ষে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ নবাব কর্ত্তৃক তেইশ লক্ষ মুদ্রা অঙ্গীকৃত হয়; কিন্তু তখন নবাব তহবিলে তত টাকার সংস্থান না থাকায় ইহার অর্দ্ধাংশ রাজকোষ হইতে এবং অবশিষ্ট বর্দ্ধমান ও কৃষ্ণনগরের রাজা ও হুগলীর ফৌজদার

হওয়া প্রভৃতি ঘটনাকে কেহ কেহ ষড়যন্ত্রের পোষক প্রমাণ বলেন। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া নিঃসংশয়ে কিছু বলা না যাইলেও সীরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও তাহাতে কৃষ্ণচন্দ্রের যোগদান বিষয় একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

ওমরবেগের প্রতি রাজকরের উপরে বরাত চিঠি প্রদত্ত হইল। পরবর্ত্তী কিস্তির ১৯ লক্ষ টাকার জন্য এইরূপ তন্‌খার ব্যবস্থা হইল এবং নদীয়া রাজ্য অঙ্গীকৃত তন্‌খার নিমিত্ত ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুরের নিকট বন্ধক রাখা হইল। এইরূপ নামতঃ নদীয়া রাজ্য মুসলমান অধিকারে থাকিলেও ইহা প্রত্যক্ত ইংরাজ কোম্পানির শাসনাধিকারে আসিয়া পড়িল। এই সময়ে ইংরাজ কোম্পানির দপ্তর অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে তদানীন্তন নদীয়াধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সমসাময়িক মান্যবান ইংরাজগণ কর্ত্তৃক অতীব সম্মানিত হইতেন কিন্তু সেই সময়ে যথাকালে রাজস্ব দিতে না পারায় কোম্পানীর কোন কোন কর্ম্মচারীর নিকট তিনি বিশেষ অবমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন।* ইংরাজ রেসিডেণ্ট স্ক্রাফ্‌টন্ তাঁহার জাতিনাশের

*Mr. Luke Scrafton writes from Maradabad to Government complaining of the arrears of revenue due in Nadia —"It is possible that by threatening the Raja with loss of his caste and such corporal punishments as are in practice among these people something more may be extarted from him. However, I suppose Ruay Dulab will either pay the balance out of the 9 lacks for the ensuing year. Therefore it is requisite, some methods must be taken to makes the best of the ensuing year. As the chief cause of balance is Raja's extravagance, it, therefore, appears to me to send a trusty reason into his country to collect his revenues for him, to deprive the Raja of all power in his country, allowing him only Rupees 10000 per annum or whatever your honour may think proper for his expenses and keep the son in Calcutta as security for the father's good behaviour; If this method is persued, it is probable the Hon'ble

ব্যবস্থা তদীয় পুত্র শিবচন্দ্রকে জামিন স্বরূপ কয়েদ রাখিবার এবং তাঁহার হস্ত হইতে নদীয়া শাসনের ক্ষমতা গ্রহণে প্রস্তাব করেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ২০শে আগষ্ট তারিখের গবর্ণমেণ্টের মন্তব্যে দেখা যায় যে তদানীন্তন নদীয়ার রাজস্ব ৯ লক্ষ টাকা মুদ্রা ধার্য্য ছিল। এই ৯ লক্ষ মুদ্রার মধ্যে ৬৪৩৪৮৲ টাকা কোম্পানীর রাজস্বের রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ৮৩৫৯৫২ টাকা নদীয়ারাজকে মুসলমান সরকারে রাজস্ব দিতে হইত। নদীয়া পূর্ব্ব হইতেই মীরজাফরের অঙ্গীকৃত তন্‌খার নিমিত্ত ইংরাজের নিকট বন্ধক থাকায় শেষোক্ত খাজনাও ইংরাজ কোম্পানীকে দিতে হইত। সে সময়ে রাজ্যের অভ্যন্তরিণ গোলযোগের জন্য কৃষ্ণচন্দ্রের পক্ষে যথাসময়ে রাজস্ব সংগ্রহ করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে। সে কারণ তিনি ক্রমাগত নানা ওজর করিয়া মালগুজারি দিতে বিলম্ব করিতে থাকেন। সুতরাং কোম্পানির প্রাপ্য টাকা আদায় করিবার প্রয়োজন হওয়ায় কোম্পানীর রাজস্ব সংগ্রাহকগণ নদীয়া রাজ্য নদীয়াধিপতির হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া শোভাবাজারের স্বনামখ্যাত রাজগণের পূর্ব্বপুরুষ রাজা নবকিশন বাহাদুর প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির সহিত তিন বৎসর মেয়াদে ইজারা বন্দোবস্ত করেন; কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা আদায় সন্তোষজনক না হওয়ায় এবং রিচার্ড বিচি সাহেবের রিপোর্ট* অনুযায়ী সদাশয় কোম্পানী

Company, may within two years receive the full of Toncaws on him.

Vide Long's selections from unpublished Records No. 337.

* Fort William 28th April 1770.

To

The Hon'ble John Cartier Esq. President & Governor and the gentlemen of the Select Committee.

বাহাদুর বাঙ্গালার এক অতি সম্ভ্রান্ত বংশের মর্য্যাদা হানি না করিয়া

"In M. R. Verelst and my joint addresses which accompanied the statement of the commencement of this season we infermed you that the Raja of Nuddea had beleaved so ill and owed so considerable a sum on account of his mulguzary that ministers recommended his not being confided in and we thought it prudent to endeavour to let the country to farm for three years on terms that would have proved very advantageous term-to employers and reserved to the Raja his rights and stipulated annual salary of one lack of Rupees. Nobkisen &c. several other principal Calcutta merchants offering themselves to become farmers on terms which appeared advantageous to the Company just to the Raja and equitable to the ryots—theirs terms were accepted and they sent people to begin the collections but it was soon found that the farmers required being invested with powers that would deprive the Raja of his just right and that they acted appressively in the distress and did not pay the revenue according to their agreement. The Rajha at the same time jealous of their authority and earnest to be again reinstated offered to comply with the terms agreed on by the farmers to pay his farmer balance and to give security for the due completion of the agreement. The ministers were very urgent for closing with the Raja's people and I was induced to acquiesce in the measure from the following condition. The farmers absolutely demanded to be invested with the Raja's rights of Zamindary which could not be granted without deposing the Zamindar in the country of his hereditary

পুনরায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত নদীয়ার মালগুজারি বন্দোবস্ত করেন এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও বাকী রাজস্ব কিস্তিবন্দী অনুযায়ী বিনা ওজরে কোম্পানীর কুঠীতে চালান দিবেন অঙ্গীকারে এক যুক্তিপত্র লিখিয়া দিয়া সে যাত্রা অব্যাহতি লাভ করেন। এই কালে যখন লর্ড ক্লাইভ বাহাদুর দিল্লীশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়াছিলেন। তখন মিঃ সামনার বর্দ্ধমানাধিপতির জন্য রাজাধিরাজ উপাধি ও ঝালরদার পালকী শিরোপা

---

right in which neither equity nor our Hon'ble master's orders would have justified us. The farmers have behaved ill and seemed either aiming at getting power and wealth than benefitting and improving the country committed to their charge. An English gentleman being appointed to supervise the Nuddea province and superintended the collections I thought he would be such a check on the Rajah as to prevent lies being able to demand the circars of its just revenues or to distress his own Ryots. The security offered by the Raja being indubitable was another motive with me for assisting to the measure which I still hope will prove to have been rightly judged the only difficialty which seems to present itself is as to the sum of Rs. 225000 said by the Rajah to have been received by the farmers, does not prove this sum against the farmers be and his securities are to make it good if he does I hope there will be no difficulty in obtaining payment of Nobkissen and the other farmers.

M. R. Ryder is now employed in setting the account &c. &c. &c.

Maidipur — With respect &c.
30th March 1770. — Richard Bechee,

Long's Selection of U. P. R. No. 5 10 &c.

প্রার্থনা করিলে কোম্পনীর দেওয়ান রাজা নবকিশন বাহাদুর আপনার নিজ তহবিল হইতে দশ সহস্র মুদ্রা নজরাণা দিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিমিত্তও ঐরূপ শিরোপা তরবারি ও মহারাজেন্দ্র বাহাদুর উপাধি প্রার্থনা করেন। * রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজেন্দ্র বাহাদুর এই উপকারের বিনিময়ে রাজা নবকিশনকে ১১৭৩ বঙ্গাব্দে শ্রীরামপুর বনাম মূলাযোড় গ্রামখানি মহোত্রান স্বরূপ প্রদান করেন। কিন্তু তদানীন্তন রেভিনিউ বোর্ডের নির্দ্দেশমত নদীয়ার কালেক্টর মিঃ রেডফারণের আদেশে নদীয়াধিপতির এরূপ দানের ক্ষমতা না থাকা অজুহাতে উক্ত মূলাযোড় গ্রাম গবর্ণমেণ্টের খাস দখলভুক্ত হয়।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করায় ভান্সিটার্ট সাহেব বাঙ্গলার কোম্পানীর কুঠীর গবর্ণর ও অধ্যক্ষ হয়েন। এই ভান্সিটার্ট কিছুকাল নদীয়ার কালেক্টর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইংরাজদিগকে অঙ্গীকৃত অর্থ পরিশোধ করিতে না পারায় সকৌন্সিল ভান্সিটার্ট সাহেব মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার সুচতুর জামাতা মীরকাশিমকে নবাব মনোনীত করেন। মীরকাশিম সন্দিগ্ধমনা কঠোর হৃদয় ও স্বাধীনচেতা শাসনকর্ত্তা বলিয়া খ্যাত। কোম্পানীর সহিত তাঁহার সদ্ভাব যে স্থায়ী হইবে না তাহা তিনি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন। সেই জন্য

---

* একান্ত রাজানুগত বিবিধ গুণান্বিত এবং রাজানুগ্রহের যোগ্য পাত্র মহারাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র বাহাদুর জ্ঞাত হইবে যে বর্ত্তমান শুভসময়ে তোমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক মহারাজেন্দ্র বাহাদুর উপাধি, পতাকা, নাকারা, ঝালরদার পালকি প্রদান করা গেল। তোমার কর্ত্তব্য যে এই অসীম অনুগ্রহের নিমিত্ত আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া সকৃতজ্ঞচিত্তে বাদসাহীর মঙ্গলসাধনে তৎপর থাক। তারিখ সপ্তম জলুস।

তিনি যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। তিনি মসনদে উপবিষ্ট হইয়া কোম্পানীর দাবী পরিশোধের নিমিত্ত বাঙ্গালা বিহারের ভূস্বামীগণকে বন্দী করিয়া তাঁহাদের দুর্দ্দশার একশেস করিয়াছিলেন। সপুত্র কৃষ্ণচন্দ্রও বন্দীগণের মধ্যে ছিলেন। এবারও রাজস্ব বাকীর দায়ে তাঁহার এই দুর্দ্দশা সংগঠিত হইয়াছিল। ইংরাজের অঙ্গিকৃত তন্‌খা পরিশোধ হওয়ায় নদীয়ার রাজ্য পুনরায় নবাবের এলেকাধীনে আসিয়াছিল। এক্ষণে নব নবাব মীরকাশিম রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট বহু অর্থ বাকী দেখিয়া বারম্বার তাহাকে রাজধানী মুরশিদাবাদে আহ্বান করেন, কিন্তু রাজা আজ দশহারা কাল দেওয়ালী—তৎপর স্ত্রীর অসুখ ইত্যাদি নানা অছিলায় রাজস্ব প্রদানে বিলম্ব করিলে নবাব ইংরাজ গবর্ণর ভান্‌সিটার্ট বাহাদুরকে রায় রায়ানের দ্বারা রাজাকে মুরশিদাবাদে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত এক লিপি প্রেরণ করেন।* রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সদাশয় ইংরাজপক্ষের শরণ লইয়া নজর ও

---

* From Rayrayan, December, 1760—"Your favourable latter acquinting me of your health I have received and our much rejoiced as to what you wrote with your favourable pen concerning the Zamindar of Nadia. The company's business and that of the Nabab, His Excellency considers as the same, and we are of regard to Nadia Zamindar. It is now two months he has put us off by saying first that his Dasohara holidays were coming on and of the worder that his Dewally holidays were at hand and now has complained to you that his wife is sick, but his reasons for being so backword to come to the city is lest he should be obliged to pay his debt and if he does not come to the city, the money will never be

রাজস্বের কিয়দংশ প্রদান করিয়া এবং নিজ মালগুজারী ১,২৮,৭৫৫৲ টাকা বৃদ্ধি স্বীকার করিয়া † লইলে কিছুদিনের জন্য পরিত্রাণ লাভ করেন কিন্তু আবার অল্পদিনের মধ্যেই বন্দী হয়েন। নবাব, বাঙ্গালার প্রধান ভূস্বামী ও ধনবান ব্যক্তিদিগকে বিশেষতঃ যাহাদিগকে তিনি ইংরাজ বাহাদুরের পক্ষভুক্ত বলিয়া সন্দেহ করিলেন তাঁহাদিগকে মুঙ্গের দুর্গে অবরোধ করিয়া পরিশেষে নৃশংসভাবে হত্যা করিলেন।

প্রবাদ ‡ এই কালে নবাবের আদেশে জগৎশেঠ, রাজবল্লভ প্রভৃতি

---

paid and will be of no service. You must acquinted from many people how much the Nabab is distressed for money to pay his troops. For this reason I have sent people to bring the Nadia Zamindar and therefore I beg you will write to the Zamindar to process speedily to the city with the money for two months revenue which he has not paid according to the kistbandi and forward the rest with the utmost expenditure.

Longs Selections of unpublished Recors No. 510.

† Grants Analysis Fifth Report. P. 321.

‡ এইকালে সপুত্র মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মুঙ্গের দুর্গে কারাবদ্ধ থাকা কালীন রাজা রামনারায়ণ, সপুত্র রাজবল্লভ, জগৎশেঠ ভ্রাতাদ্বয়, সপুত্র বৃদ্ধ রাজা ফতেসিং, বুনিয়াদসিং প্রমুখ দেশের গণ্যমান্য হিন্দু বন্দীগণের সহিত নৃশংসভাবে নিহত করিবার আদেশের কথা কুত্রাপি লিখিত দেখা যায় না; পরন্তু এইকালে তাঁহাদের মুরশিদাবাদে বন্দী অবস্থায় থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। এইজন্যই আমরা এই ঘটনাকে প্রবাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে কৃষ্ণচন্দ্রের এইকালের যে একখানি প্রতিমূর্ত্তি পটে অঙ্কিত আছে বলিয়া খ্যাত সেখানি যে কেহ দর্শন করিয়াছেন তাঁহাকেই এখানিকে প্রমাণ্য বলিয়া গ্রহণ

অন্যান্য বন্দীর সহিত সপুত্র কৃষ্ণচন্দ্রেরও প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়, কিন্তু কৌশলী কৃষ্ণচন্দ্র "যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ" মনে করিয়া নবাবের কর্ম্মচারীগণকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া তৎকালোচিত এক যজ্ঞের আয়োজন প্রার্থনা করেন। সেজন্য তাঁহাদের প্রাণদণ্ডে বিলম্ব ঘটে। এ দিকে ইংরাজের সহিত মীরকাশেমের যুদ্ধ বাধিয়া উঠে এবং বিজয়লক্ষ্মী ইংরাজ বাহাদুরের সহায় হওয়ায় নবাব পরাজিত হইয়া মুঙ্গের ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন; সুতরাং সপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র সে যাত্রা রক্ষা পান। মীরকাশিম গুরগন্ খাঁ প্রভৃতি সেনাপতিবর্গের অকর্ম্মণ্যতায় পলাশী অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে বার বার পরাজিত হইয়া পরিশেষে অযোধ্যায় পলায়ন করেন, পরে

করিতে হতাশ হইতে হইবে। তাহা কোন অনিপুণ শিক্ষানবীশ চিত্রকরের দেশের প্রবাদানুযায়ী অঙ্কিত একখানি পটমাত্র। মুঙ্গেরে মীরকাশেমের করাল কবল হইতে পূজার ছলে সপুত্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রক্ষাপ্রাপ্তির কথা সন্দেহ না করিয়া থাকা যায় না। ক্ষিতীশ বংশাবলি চরিতে কার্ত্তিকেয় বাবু শাখাপল্লবে সুসজ্জিত করিয়া এই প্রবাদ লিখিতে যাইয়া নিজেই ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া ১২৬ পৃষ্ঠায় পাদ টীকায় যেন কৈফিয়ত হিসাবেই লিখিয়াছেন, —"যে কৌশলে রাজা ও রাজপুত্র আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পান তাহা অনেকের আপাততঃ অলীক বোধ হইতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের যেরূপ অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা এবং নবাবী সময়ের যেমন কার্য্যপ্রণালী ছিল তাহাতে এরূপ সংঘটন হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। ইহাও অসম্ভব নয় যে এই কৌশলের সঙ্গে সঙ্গে বিলক্ষণ প্রলোভনও প্রদর্শিত হইয়াছিল" যদি বুদ্ধিমত্তা প্রকাশে বা উৎকোচে বশীভূত করিয়া পরিত্রাণের উপায় থাকিত তবে পূর্ব্বোক্ত বন্দীগণের এমন শোচনীয় পরিণাম ঘটিত না। অভাগা রামনারায়ণের এবং শেঠদ্বয়কে গলদেশে বালুকাপূর্ণ গণি বাঁধিয়া ভাগীরথী গর্ভে নিমগ্ন করা হয়। অন্যান্য সকলে নানারূপে নিৰ্য্যাতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

অযোধ্যার নবাব ও দিল্লীশ্বর সাহ আলমের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজদিগকে আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হন এবং অল্পদিন মধ্যেই মানবলীলা সম্বরণ করেন এবং মীরজাফর পুনরায় নবাব নির্ব্বাচিত হন। এই বিপ্লবের কালে যেমন করিয়াই হউক সপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র কারাগার হইতে পলায়ন করিলেও তদানীন্তন সর্ব্বাধিকারী নন্দকুমারের চক্রে মুরশিদাবাদের ফৌজদার কিয়ৎকালের জন্য তাঁহাদিগকে রাজধানীতে আনিয়া প্রহরি বেষ্টিত করিয়া রাখেন। ভান্সিটার্টের বিশেষ অনুরোধে ফৌজদার রেজা খাঁ শেষে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। *

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দুই মহিষী। জ্যেষ্ঠা রাণীর গর্ভে শিবচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র, হরচন্দ্র, মহেশচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র নামে পাঁচ পুত্র এবং অন্নপূর্ণা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন এবং কনিষ্ঠ রাণীর গর্ভে শম্ভুচন্দ্র নামে এক পুত্র এবং বিশ্বেশ্বরী, উমেশ্বরী ও দুর্গেশ্বরী নামে তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। রাজকুমারদিগের মধ্যে শিবচন্দ্র যেমন শান্তস্বভাব ও পিতৃভক্ত ছিলেন, শম্ভুচন্দ্র তেমনি উদ্ধত প্রকৃতি ও পিতার অবাধ্য ছিলেন। শুনা যায় যখন রাজা ও শিবচন্দ্র মুঙ্গেরে কারারুদ্ধ থাকেন সেই সুযোগে শম্ভুচন্দ্র পৈতৃক জমিদারী ও ধনাগার অধিকার করেন। এবং যখন মুঙ্গের কারাগারস্থ অপরাপর বন্দীগণের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হয়, তখন তিনি পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুঘোষণা করিয়া বিশেষ সমারোহের সহিত পিতৃগদিতে অধিরূঢ় হয়েন; তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, করালকবলে তাঁহারা পতিত হইয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহাদের নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু যখন সপুত্র মহারাজা সে যাত্রা রক্ষা পাইয়া মুরশিদাবাদে আগমন করিলেন, তখন শম্ভুচন্দ্র অতীব লজ্জিত ও

* Long's record—Letter to Irij Khan 11th May 1764.

অনুতপ্ত হইয়া কতরূপ ক্রটী স্বীকার পূর্ব্বক পিতা ও ভ্রাতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলেন। রাজা মুন্সী দ্বারা তাহার যথোচিত উত্তর লেখাইয়া স্বাক্ষরের নিম্নদেশে স্বহস্তে এই কয়েক পঙ্ক্তি লিখিলেন যে—

হস্তিশুণ্ডে লক্ড়ি দিলে ছাড়ান মস্কিল।
কূশার ভূমিতে বীজ কাড়ান মস্কিল॥
মনঃশিলা ভাঙ্গিলে যোড় লাগান মস্কিল।
তাঁহাদিগা থামিদেরে ভুলান মস্কিল॥

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে মিরণের নিধনান্তে বৃদ্ধ নবাব মীরজাফর পুনরায় নবাব মনোনীত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি পুত্র মিরণের শোকে ও স্থবির বিধায় নিতান্তই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন ও অচীরে ১৭৬৫ অব্দে পরলোক গমন করেন এবং তৎপুত্র নজমদ্দৌলা ইংরাজ কর্ত্তৃক নবাব মনোনীত হয়েন। এই সময়ে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে ক্লাইভ ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট হইতে লর্ড উপাধিভূষিত হইয়া মুসলমানের সহিত বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্ত কোম্পানির ডিরেক্টরগণ কর্ত্তৃক এদেশে পুনঃ প্রেরিত হয়েন। তিনি কলিকাতা প্রত্যাগমন করিলে চতুর্দ্দিক হইতে নবাব ও জমিদারগণ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিতে নজর প্রেরণ করিতে লাগিলেন। নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রও পঞ্চমহর ও তৎকালোচিত সৌজন্যপূর্ণ এক লিপি প্রেরণ করিয়া ভাগ্যবান ক্লাইবের সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

ক্লাইভ মুর্শিদাবাদে যাইয়া নূতন নবাবের সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক বন্দবস্ত করিলেন যে সৈন্য সংক্রান্ত ও রাজ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় অন্যান্য ভার ইংরাজ কর্ম্মচারীগণের হস্তে থাকিবে, করসংগ্রহ, শাসন ও বিচার প্রভৃতি কার্য্য নবাবের কর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইবে এবং ঐ সকল কার্য্য ও সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নবাব বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকা পাইবেন।

অনন্তর ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই আগষ্ট তারিখের প্রদত্ত বাদশাহী সনন্দবলে মহামান্ত ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালা, বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলেন এবং ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে পুণ্যাহ করিয়া কার্য্যতঃ বঙ্গের শাসনভার হস্তে লইয়া এতদ্দেশের রাজস্বের উন্নতি বিধানে মনঃসংযোগ করিলেন প্রথমতঃ তাহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে মুসলমান আমলের প্রথম অবস্থায় বাঙ্গালার ভূম্যাধিকারীগণের পূর্ব্বপুরুষগণ কেবল রাজস্ব সংগ্রাহক ছিলেন। ক্রমে পুরুষানুক্রমে জমিজমার সহিত পরিচিত হওয়ায় ও কাগজপত্র তাঁহাদের ঘরে থাকায় তাঁহারা পুরুষানুক্রমিক জমিদার হইয়া উঠেন। এক্ষণে যে কেহ অধিক রাজস্ব দিতে সম্মত হইবে তাহাকেই জমিদারী জমা দেওয়া হইবে এইরূপ ঘোষণা করা হইল কিন্তু প্রথম প্রথম ইহাতে কোন ফল হইল না বিশেষতঃ এই সময়ে রাজপরিবর্ত্তনের অনিবার্য্য ফলে ও ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দের অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শস্তের ক্ষতি হওয়ায় বাঙ্গালাদেশে করালমূর্ত্তি দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর বিজয় ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। এই দুর্ভিক্ষে দেশের একতৃতীয়াংশ অধিবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। * শুনা যায় অট্টালিকায়, পর্ণকুটীরে, পথে, প্রান্তরে, হাটে, ঘাটে, মাঠে, লোকালয়ে যেখানে সেখানে দলে দলে মানুষ ও গৃহপালিত পশ্বাদি মরিয়া পড়িয়া থাকিত, কেহ কাহাকে দেখিবার বা কেহ কাহাকে ফেলিবার ছিল না; এই নিদারুণ ঘটনা বাঙ্গালা ১১৭৬ সালে সংঘটিত হওয়ায় ইহা "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" নামে খ্যাত। এই মন্বন্তরের বেগ ক্রমে প্রশমিত হইলে ইংরাজরাজ নবলব্ধ রাজ্যের রাজস্ব ও তৎসংক্রান্ত

---

* Vide Lord Macaulay's graphic description of the great famine in his essay on Lord Clive.

Vide Hunter's unpublished Bengal M. S. S. Records No. 211.

ব্যাপারে ধীরে ধীরে মনোযোগী হইয়া পড়িলেন ও বাঙ্গালা দেশকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া জমিদারগণের সহিত নূতন মেয়াদী বন্দবস্ত করিতে লাগিলেন ও কমিটি ও সার্কিট্ নামে এক কমিটীর নিযুক্ত করিলেন।* উক্ত কমিটির সাহেবেরা সর্ব্বাগ্রে নদীয়ায় আসিয়া নদীয়া জমিদারীর রাজস্ব বন্দবস্ত করিতে বসেন।

এই সময়ে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভূপ বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন যখন তাঁহার জীবদ্দশাতেই সম্ভুচন্দ্র তাঁহার মৃত্যুঘোষণা করিয়া রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন তখন তাঁহার মৃত্যু অন্তে ভ্রাতাদিগের সহিত আরও কি কুব্যবহার করিবেন। ইহা চিন্তা করিয়া উক্ত কমিটি হইতে তাৎকালীন নিয়মানুযায়ী ১৭৭৩ হইতে ১৭৭৬ অব্দ পর্য্যন্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার শিবচন্দ্রের নামে চারি বৎসর মেয়াদে জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন এবং পরে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে এক অভিলষিত ব্যবস্থা পত্রের দ্বারা শিবচন্দ্রকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ইংরাজের সুশাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফলস্বরূপ আমরা এতদ্দেশে মৃত্যুর পূর্ব্বে বিষয়াদির বিধি বন্ধনের জন্ত এই প্রথম উইল পত্রের সৃষ্টি দেখিতে পাই। মহারাজা তাৎকালিক গবর্ণর জেনারেল্ ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ বাহাদুরের নিকট আবেদন পূর্ব্বক তাঁহার একজন সাহেব ও একজন মুনসিকে রাজবাটিতে লইয়া তাঁহাদের সমক্ষে বঙ্গভাষায় এক দানপত্র † ও পারস্তভাষায় এক তক্ বীজ

* Hunter's "Annals of Rural Bengal P. 287, 390, 387, 385."

† ঐ দানপত্রের অবিকল নকল নিম্নে লিখিত হইল, প্রাণাধিক প্রিয়তম রাজশেখী শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র রায় পরমকল্যাণাস্পদেষু।

আমার বয়ঃক্রম হইয়াছে তাহাতে এখন সদব মফস্বল মলকি কোন বিষয় মামলত যে আমি করি তাহার সময় নহে। পারলৌকিক যে যে ব্যাপার

নামা লেখাইয়া তাহাতে ঐ সদস্ত সাহেবের ও মুনসীর সাক্ষর ও মোহর করিয়া লয়েন। এতদ্বারা তাঁহার সম্পত্তি জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রকে দান করিয়া অন্যান্য পুত্রগণের খরচাদির নিমিত্ত সালিয়ানা মোট ৪০০০০৲ টাকা মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া যান। এইরূপে দানপত্র লিখিয়া দিয়া শিবচন্দ্রের নামে জমিদারীর রাজসনন্দ প্রাপ্তি উৎযোগ করিতে করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বনামখ্যাত দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ তখন হেষ্টিংসের দেওয়ান। তাঁহার কৃপা ব্যতীত তখন কোন কার্য্যই সুলভ ছিল না। কনিষ্ঠ কুমার শিবচন্দ্র এযাবৎ মনে করিয়াছিলেন যে তিনি যখন কনিষ্ঠ রাণীর একমাত্র সন্তান তখন পিতৃরাজ্যের অর্দ্ধাংশ তাঁহার অধিকার কিন্তু

তাহাই আমার কর্ত্তব্য একারণ আপনি স্বস্বরূপে মেজাজে এই স্থির করিলাম পুরুষক্রমে আপনার নিজের রাজ্য কখন হিস্‌সা হয় নাহি অতএব ওখড়া ওগয়রহ আমার সমস্ত জমিদারী ও ঝলরদার পালগী ও সম্বৎ প্রভৃতি হুজুরের প্রণায়তি ময়াস্তব ও খসরমাল সাবেক ও দরি যে আছে দরবস্ত আপন খুসী ও রাজী বগবস্তে তোমাকে সমস্ত লিখিয়া দিলাম শ্রীশ্রী৺ দেবদেবী প্রভৃতি ও জমিদারী লওয়া জমাখরচ আখরাজাত ও নাযশ লোকসান সমস্ত তোমারই তোমার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের সহিত এলেকা নাহি। প্রাণাধিক প্রিয়তম বাজপেয়ী শ্রীযুক্ত মহেশ দেবের দশ হাজার ও প্রাণাধিক প্রিয়তম বাজপেয়ী শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র দেবের দশ হাজার ও ভৈরবচন্দ্র দেবের পুব্যপুত্র প্রাণাধিক প্রিয়তম বাজপেয়ী শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র দেবের আড়াই হাজার ও হরেন্দ্রদেবের পুব্যপুত্র প্রাণাধিক প্রিয়তম বাজপেয়ী শ্রীযুক্ত বজ্রচন্দ্র দেবের আড়াই হাজার একুনে এই চল্লিশ হাজার টাকা খরচের জন্য মোকরার করিয়া দিলাম। এই নিয়ম যে করিলাম তাঁহারা এবং কেহ কখন করিবেন এই নিয়মের অন্যমত আচরণে উদ্যত হও তবে লোকধর্ম্মত এবং হাকিমানের নিকট যে নামঞ্জুর ইতি—সন ১১৮৭ সাল এগার শত সাতাশী সাল তারিখ ১ জ্যৈষ্ঠস্য।

এক্ষণে অন্যরূপ বিধান দেখিয়া তিনি গঙ্গাগোবিন্দের শরণাপন্ন হয়েন। স্বীয় স্বাভাবিক চতুরতার সাহায্যে হেষ্টিংসের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দকে স্বীয় পক্ষভুক্ত করিয়া আপনার নামে পূর্ব্বেই মহামান্য কোম্পানী বাহাদুরের নিকট হইতে জমিদারীর সনন্দ বাহির করিতে চেষ্টা করেন। এই ব্যাপার অবগত হইয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গাগোবিন্দকে এই কয়েকটী কথা লিখিয়া পাঠান।—"পুত্র অবাধ্য, দরবার অসাধ্য, ভরসা গঙ্গাগোবিন্দ।" যাহা হউক মহারাজ সে যাত্রা তাঁহার সুচতুর দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ মহাশয়ের দ্বারা মহামান্য হেষ্টিংসের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণনপূর্ব্বক শিবচন্দ্রের নামেই জমিদারীর সনন্দ ও মহারাজাধিরাজ উপাধির এক ফায়্মান্* বাহির করিয়া লন। এই ঘটনার অব্যাবহিত পরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সস্ত্রীক কুমার শিবচন্দ্রকে মহাসমারোহে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। এই অভিষেক উপলক্ষে মহতী ঘটনা হইয়াছিল; শাস্ত্রবিহিত দৈবকার্য্য সমাপনান্তে বৃদ্ধ মহারাজ যুবরাজের হস্তধারণ পূর্ব্বক সিংহাসনে অধিরোহিত করিলেন। সহোদরগণের মধ্যে একজন তদীয় মস্তকে রাজছত্র ধারণ করিলেন। আর দুইজন চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। তৎপরে মহারাজা স্বয়ং শিবচন্দ্রের সম্মুখীন হইয়া রাজ সম্ভাষণে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। তৎপরে অন্য সকলে সম্পর্ক অনুযায়ী কেহ আশীর্ব্বাদ, কেহ বা অভিবাদন করিলেন। এই রাজ্যাভিষেক সময়ে শাস্ত্রোক্ত নিয়ম রক্ষার্থ শিবচন্দ্র সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। একখানি সুদীর্ঘ বস্ত্রের এক প্রান্ত রাজার অঙ্গে ও অপর প্রান্ত মহিষীর অঙ্গে সংলগ্ন করা হইয়াছিল। এইরূপে পুত্রের স্কন্ধে দুর্ব্বহ রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বৃদ্ধ মহারাজা রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

মহারাজা রাজেন্দ্র অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভূপ এই

---

* এই ফায়্মান অদ্যাপী কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে সুরক্ষিত আছে।

সময়ে অতি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার সমগ্র জীবনব্যাপী ধারাবহিক কর্ম্ম ও উৎকণ্ঠানিচয় তাঁহার স্বাস্থ্যেরও সমূহ ক্ষতি করিয়াছিল। এক্ষণে কর্ম্মবীর মহারাজা নিজের অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী বুঝিতে পারিয়া কৃষ্ণনগর হইতে দুই ক্রোশ পশ্চিমে ও বর্ত্তমান নবদ্বীপের এক ক্রোশ পূর্ব্বে অলকন্দা নাম্নী খড়িয়ার এক শাখানদী যাহা ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছিল, অধুনা তাহার গর্ভ মৃত্তিকাপূর্ণ হইয়াছে ও যাহা কেবল ইদানীং বর্ষাকালে ভাগীরথীর দক্ষিণ অংশের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। উক্ত নদীর পূর্ব্বোক্ত নামকরণ করিয়া তত্তীরে এক সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মাণপূর্ব্বক ঐ স্থানকে গঙ্গাবাস নাম দিয়া বাস করিতে থাকেন।

এই গঙ্গাবাসের সমস্ত প্রাসাদ ও অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়াছে। কেবলমাত্র মহারাজের নিজের স্থাপিত হরিহরের মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া মহারাজের ধর্ম্মমতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ঐ মন্দির ললাটে এই শ্লোকটী লিখিত আছে,—

> "গঙ্গাবাসে বিধিশ্রুত্যনুগত সুকৃত ক্ষৌণিপালঃ শকেস্মিন্
> শ্রীযুক্ত বাজপেয়ী ভূবি, বিজিত-মহারাজরাজেন্দ্র দেবঃ॥
> ভেত্তুং ভ্রান্তিঃ মুরারি ত্রিপুরহরভিদাসঞ্জাতাং পমরাণাং
> অদ্বৈতং ব্রহ্মরূপং হরিহরমূনময়া স্থাপয়ল্লোনয়া চ॥"

ভাবার্থে ঃ—যে পামর সকল শিব ও বিষ্ণুকে পৃথক্ জ্ঞানে একের বিদ্বেষ করে সেই সকল নিরয়গামী ব্যক্তিগণের ভ্রান্তিবিনোদনার্থ, ভুবনবিদিত বাজপেয়ী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক ১৬৯৮ শকে (১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে) গঙ্গাবাসে এই মন্দির ও তন্মধ্যে হরিহরের অদ্বৈত মূর্ত্তি লক্ষ্মী ও উমার সহিত স্থাপিত হইল।

পূর্ব্বোক্ত দেবদেবীর মূর্ত্তি ব্যতীত রামপদক অত্রস্থ পূর্ব্ব সমৃদ্ধি শেষ

চিহ্নরূপ বিদ্যমান আছেন। কথিত আছে এই রামপদক বা শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্ন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র চিত্রকূট পর্ব্বত হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

এই গঙ্গাবাসে বাসকালে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটে নাই। কেবলমাত্র তৎকালীন উদীয়মান ধনী শোভাবাজারের স্বনামখ্যাত পূর্ব্ব-পুরুষ, মহামান্য হেষ্টিংস বাহাদুরের পার্সীশিক্ষক মুন্সী নবকৃষ্ণ কর্তৃক মহারাজার এলেকাস্থিত অগ্রদ্বীপের দয়াল ঠাকুর গোপীনাথ জীউ অপহৃত হইলে মহারাজা ইহাঁর প্রতিবিধান মানসে অন্যরূপে নবকৃষ্ণের শাস্তিবিধান না করিয়া নবকৃষ্ণের আশ্রয়দাতা হেষ্টিংস সাহেবের নিকট অভিযোগ করেন। গোপীনাথ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ নহে, উহা এক উদাসীনের স্থাপিত, উহাতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কোন স্বত্ব নাই ইত্যাদি নানা কারণ দর্শাইলেও জেনেরল হেষ্টিংসের নিরপেক্ষ বিচারে নবকৃষ্ণ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে বিগ্রহ প্রত্যার্পণ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হয়েন। নবকৃষ্ণ বিচারে পরাজিত হইয়া এক অপূর্ব্ব কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি এক সুনিপুণ ভাস্কর দ্বারা এক অভিনব অভিন্ন মূর্ত্তি গোপীনাথ বিগ্রহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক দুই মূর্ত্তি একই সিংহাসনে স্থাপনা পূর্ব্বক কৃষ্ণচন্দ্রের প্রেরিত গোপীনাথ সেবককে তাহার বিগ্রহ গ্রহণ করিতে বলিলেন। কথিত আছে, কৃষ্ণচন্দ্র পূর্ব্ব হইতে চাতুরির সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া গোপীনাথের শরণাপন্ন হয়েন। ভক্তবৎসল ভক্তির আকুল প্রার্থনায় সদয় হইয়া রাত্রে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ করেন যেন তিনি তাঁহার পরিচারককে বলিয়া দেন অভিন্ন দুই গোপীনাথ মূর্ত্তির মধ্যে যাহার কপোলদেশে ঘর্ম্মবিন্দু লক্ষিত হইবে তাঁহাকেই যেন লইয়া আসে। পূর্ব্বনির্দ্দেশ অনুযায়ী গোপীনাথ-পরিচারক সিংহাসন সমীপে উপস্থিত হইয়া একাসনে দুই অভিন্ন মূর্ত্তি বিগ্রহ দর্শনপূর্ব্বক প্রথমে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল, কিন্তু পরক্ষণেই দেখিল তাহার চিরসেবিত ঠাকুরের অলকাবলী ভেদ

করিয়া বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মে কপোলদেশ সিক্ত হইয়াছে তখন আনন্দে বিহ্বল হইয়া চির আকাঙ্ক্ষিত ধনকে বুকে তুলিয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উৎকণ্ঠিত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ক্রোড়ে আসিয়া অর্পণ করিল। এই গোপীনাথ জীউ বহুদিনের প্রাচীন দেবতা। কথিত আছে তিনি কলি পাবনাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম শিষ্য গোবিন্দ ঘোষের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ! উক্ত গোবিন্দ ঘোষ প্রগাঢ় যত্নে ও স্নেহে শ্রীচৈতন্যের সেবা করিতেন। একদিন ভোজনান্তে শ্রীচৈতন্য মুখশুদ্ধি চাহিলে উক্ত ঘোষ তৎক্ষণাৎ তাঁহার পূর্ব্বদিনের সঞ্চিত হরিতকী তাঁহার হস্তে দিলে শ্রীচৈতন্য তাঁহার এই সঞ্চয় স্পৃহা দেখিয়া লোকশিক্ষার্থে তাঁহাকে বলিলেন "যখন অদ্যাপি তোমার সঞ্চয়ের ইচ্ছা রহিয়াছে তখন আমার সঙ্গ পরিত্যাগ কর।" এই নিদারুণ বাক্যে ঘোষ মর্ম্মাহত হইয়া বজ্রাদপি কঠোর শ্রীপ্রভুর আদেশে তাঁহার সঙ্গত্যাগ করিয়া তাহারই উপদেশানুরূপ নিজ বাসস্থান অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ মূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক পুত্র নির্ব্বিশেষে সেবা করিতে থাকেন। এই ঘোষের একটী পুত্র ছিল। তাহার মৃত্যুতে তিনি কাতর হইয়া পড়িলে এই বিগ্রহমূর্ত্তি তাঁহাকে স্বপ্নাদেশে শোক ত্যাগ করিয়া তাঁহার সেবায় প্রাণার্পণ করিতে আদেশ করেন এবং তিনি স্বয়ং প্রতি বৎসর তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য্য করিবেন বলিয়া আশ্বস্ত করেন। অদ্যাপী গোপীনাথ মূর্ত্তি প্রতি বৎসর বারুণির পূর্ব্বে চৈত্রমাসে কৃষ্ণপক্ষের একাদশী তিথিতে তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। এতদুপলক্ষে অদ্যাপি তথায় ঐ তিথিতে প্রতিবৎসর মেলা হইয়া থাকে। নবাব মুরশিদকুলির সময়ে যখন অগ্রদ্বীপ পাটুলির রাজাগণের এলেকাধীন ছিল এবং যখন এখানকার শ্রীশ্রীগোপীনাথ জিউর মেলায় প্রতিবৎসর অন্যূন এক লক্ষ লোকের সমাবেত হইত, তখন এখানকার এই অসাধারণ জনতায় পিষ্ট হইয়া কতক-গুলি লোক প্রাণত্যাগ করে, এই সংবাদ নবাবের কর্ণগোচর হইলে তিনি

এইরূপ অকারণ নরহত্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া যখন ঐ স্থানের জমিদারকে শাস্তি দিবার জন্য, অগ্রদ্বীপ কোন্ জমিদারের জমিদারীভুক্ত এই বিষয় জমিদারগণের পক্ষের মোক্তারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন কি জানি প্রভুর কি শাস্তি হইবে মনে করিয়া উক্ত জমিদারের মোক্তার অন্যান্য মোক্তারগণের সহিত ঐ স্থান তাঁহার মনিবের নহে এই কথা বলায় নবদ্বীপাধিপতির সুচতুর মোক্তার এই অপ্রত্যাশিত সুযোগে কাতরকণ্ঠে, উহার তাঁহার মনিবের এলেকাধীন স্বীকার করিয়া যথাবিহিত উত্তরদানে নবাবের ক্রোধ শান্তি করিয়া চতুরতাফলে অগ্রদ্বীপ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রভুকে জ্ঞাপন করেন। তখন নদীয়ার রাজা শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউকে এইরূপ অপ্রত্যাশিতরূপে স্বীয় তত্ত্বাবধানে প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করেন এবং তাহার সেবার নিমিত্ত বর্ত্তমান কুষ্টিয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী কতিপয় গ্রাম দেবসেবায় অর্পণ করেন ও ঐ সকল স্থানের নাম রাখেন গোপীনাথবাদ। এই গোপীনাথবাদই বর্ত্তমান কালের কুষ্টিয়া।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনা ব্যতীত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের গঙ্গাবাসকালে আর কোন বিশেষ অশান্তিকর ঘটনা ঘটে নাই। তিনি এখানে একাগ্রচিত্তে সাধনার নিযুক্ত থাকিয়া ১১৮৯ অব্দের ২২শে আষাঢ় ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে পবিত্র অলকনন্দা তীরে তনুত্যাগ করেন।

সভাসদ্‌বৃন্দ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং যেমন বিদ্বান্ ও সর্ব্বগুণাধার ছিলেন তেমনি বিদ্যা ও গুণের অতিশয় আদর করিতেন। গুণগ্রাহী বলিয়া সমুদার বাঙ্গালা তথ্য সমগ্র ভারতে তখন তাঁহার খ্যাতি পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, একারণে তাঁহার সভায় সর্ব্বদা নানা দিগ্‌দেশ হইতে প্রধান প্রধান পণ্ডিত গণের সমাগম হইত, তিনিও ভূমিদানে ও নানা পুরস্কার প্রদানে তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিতেন এবং সজ্জনসহবাসে ও বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদে অবকাশকাল অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার সভা প্রাচীন ভারতাধিপতি—বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন শোভিত তুল্য ছিল বলিয়া খ্যাত।* দিগ্‌দেশাগত পণ্ডিত মণ্ডলীর বিদ্যার বিমল আলোকে বিক্রমাদিত্যের সভা যেমন সমুজ্জ্বল ছিল রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাও তদ্রূপ নবদ্বীপের ন্যায়বিৎ হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, কালিদাস ভট্টাচার্য্য- রামবল্লভ

---

* আমাদের দেশের রত্নরাজির মধ্যে নয়টী সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত, যথা, মাণিক, হীরক, ইন্দ্রনীল, পদ্মরাগ, মরকত, প্রবাল, মুক্তা, সূর্য্যকান্ত এবং চন্দ্রকান্ত একারণে কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করিতে হইলে এই রত্নরাজির সহিত উহারা তুলিত হয়। ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সভার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলী সেইজন্ত নবরত্ন নামে খ্যাত। তাঁহাদের নাম ক্ষপনক, ধন্বন্তরী, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পার, কালিদাস, বরাহ মিহির ও বররুচি।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভার পাঁচজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত তেমনি পঞ্চরত্ন নামে খ্যাত। ইঁহারা কালিদাস, বাণেশ্বর, কবিচন্দ্র, ভারত ও অসিতনাথ। ইঁহাদের মধ্যে কবিচন্দ্র অসিত ও কালিদাসের বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হই নাই।

বিদ্যাবাগীশ, রুদ্ররাম তর্কবাগীশ, শরণ তর্কালঙ্কার, মধুসূদন ন্যায়লঙ্কার, কান্ত বিদ্যালঙ্কার, অশিতনাথ, কবিচন্দ্র, শঙ্কর তর্কবাগীশ, ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন শান্তিপুরের রাধামোহন গোস্বামী, রামরুদ্র বিদ্যানিধি প্রমুখ ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতগণ ও গুপ্তিপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, সুকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ও হালিসহরবাসী রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতি সুকবিগণ এবং উলার মুক্তিরাম মুখোপাধ্যায়, হাস্যার্ণব গোপাল ভাঁড় প্রভৃতি হাস্যরসিক ও উপস্থিত বক্তা প্রভৃতির অপূর্ব্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ছিল, সুকবি ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে কৃষ্ণচন্দ্রের সভা বর্ণনায় তাৎকালিক রাজপরিবার ও রাজসংসারভুক্ত বহু প্রধান প্রধান ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সভাস্থ সমস্ত প্রধান পণ্ডিতমণ্ডলীর বা কবিগণের নামোল্লেখ করেন নাই। যাহাই হউক এখানে উহা যথাযথ উদ্ধৃত হইল,—

নিবেদন অবধান কর সভাজন।
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভার বিবরণ॥
চন্দ্রে সবে ষোলোকলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥
পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি চন্দ্রেরে দেখিলে।
কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মিলে।
চন্দ্রের হৃদয়ে কালী কলঙ্ক কেবল।
কৃষ্ণচন্দ্র হৃদে কালী সর্ব্বদা উজ্জ্বল॥
দুই পক্ষ চন্দ্রের অসিত সিত হয়।
কৃষ্ণচন্দ্রে দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময়।
প্রথম পক্ষেতে পাঁচ কুমার সৃজন।
পঞ্চদেহে পঞ্চমুখ হইল পঞ্চানন॥

প্রথম সাক্ষাৎ শিব শিবচন্দ্র রায়।
দ্বিতীয় ভৈরবচন্দ্র ভৈরবের প্রায়॥
তৃতীয় যে হরচন্দ্র হর অবতার।
চতুর্থ মহেশচন্দ্র মহেশ আকার॥
পঞ্চম ঈশানচন্দ্র তুল্য দিতে নাই।
ফুলের মুখটি জয় গোপাল জামাই॥
দ্বিতীয় পক্ষের যুবরাজ রাজকায়।
মধ্যম কুমার খ্যাত শম্ভুচন্দ্র রায়॥
জামাতা কুলীন রামগোপাল প্রথম।
সদানন্দময় নন্দগোপাল মধ্যম॥
শ্রীগোপাল ছোট সবে ফুলের মুখটী।
আদান প্রদানে খ্যাত ত্রিকুলে পালটী॥
রাজার ভগিনীপতি দুই গুণধাম।
মুখটী অনন্তরাম চট্টবলরাম॥
বলরাম চট্টসুত ভাগিনা রাজার।
সদাশিব রায় নাম শিব অবতার॥
দ্বিতীয় অনন্তরাম মুখুয্যের সুত।
রায় চন্দ্রশেখর অশেষ গুণযুত॥
ভূপতির ভগ্নিজামাই গুণধাম।
বঁড় ড়ি গোকুল কৃপারাম দয়ারাম॥
মুর্থ কৃষ্ণজীবন কৃষ্ণভক্তের সার।
পাটকেন্দ্র গদাধর তর্ক অলঙ্কার॥
ভূপতির পিসা শ্যামসুন্দর চাতুতি।
তার কৃষ্ণদেব রামকিশোর সন্ততি॥

ভূপতির পিশার জামাই তিনজন।
কৃষ্ণানন্দ মুখ্যা পরম যশোধন ॥
মুখ্যা অনন্দিরাম কুলের আগার।
মুখ রাজকিশোর কবিত্ব কলাধর ॥
প্রিয়জ্ঞাতি জগন্নাথ রায়. চাঁদ রায়।
শুকদেব রায় ঋষি শুকদেব প্রায় ॥
কালিদাস সিদ্ধান্ত পণ্ডিত সভাসদ্।
কন্দর্প সিদ্ধান্ত আজি কত পরিষদ ॥
কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কুলীনপ্রিয় বড়।
মুক্তিরাম মুখয্যা গোবিন্দভক্ত দড় ॥
গণক বাঁড়ুয্যা অনুকূল বাচস্পতি।
আর যত গণক গণিতে কি শকতি ॥
বৈদ্যমধ্যে প্রধান গোবিন্দরাম রায়।
জগন্নাথ অনুজ নিবাস সুগন্ধায় ॥
অতি প্রিয় পরিষদ শঙ্কর তরঙ্গ।
হরহিত রামবোল সদা অঙ্গ সঙ্গ ॥
চক্রবর্ত্তী গোপাল দেয়ান সহবতি ॥
রায় বক্সী মদন গোপাল মহানতি ॥
কিঙ্কর লাহিড়ী দ্বিজ মুনসী প্রধান।
তার ভাই গোবিন্দ লাহিড়ী গুণবান ॥
কালোয়াত গায়ন বিশ্রাম খাঁ প্রভৃতি।
মৃদঙ্গী সমজ খেল কিন্নর আকৃতি ॥
নর্ত্তক প্রধান সের মামুদ সভায়।
মোহন খোষাল চন্দ্র বিদ্যাধর প্রায় ॥

ঘড়িয়াল কার্ত্তিক প্রভৃতি কতজন।
চেলা খানেজাদ যত কে করে গণন॥
সেফাহীর জমাদার মামুদ জাফর।
জগন্নাথ শিরপা করিলা যার পর॥
ভূপতির তীরের ওস্তাদ নিরুপম।
মুজঃফর হুশেন মোগল বর্ণ সম॥
হাজারি পঞ্চমসিংহ ইন্দ্রসেন সুত।
ভগবন্ত সিংহ অতি যুদ্ধে মজবুত॥
যোগরাজ হাজারি প্রভৃতি আর যত।
ভোজপুরে সোয়ার ভোঁদেলা শত শত॥
মুল্লমালে রঘুনন্দন মিত্র দেয়ান।
তার ভাই রামচন্দ্র রাঘব ধীমান॥
আমীন রাঢ়ীয় দ্বিজ নীলকণ্ঠ রায়।
দুই পুত্র তাহার তুল্য কায়॥
বড় রামলোচন অশেষ গুণধাম।
ছোট রামকৃষ্ণ রায় অভিনব কাম॥
দেয়ানের পেসকার বসু বিশ্বনাথ।
আমীনের পেসকার কৃষ্ণসেন সাথ॥
রত্নগজ আদিগজ দিগ্‌গজ সখ্যায়।
উচ্চৈঃশ্রবা উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের লেখায়॥
হাবসী ইমামবক্স হাবসী প্রধান।
হাতী ঘোড়া উট আদি তাহার যোগান।
অধিকার রাজার চোরাশী পরগণা।
খাড়ী জুড়ী আদি করি দপ্তের গণনা॥

রাজ্যের উত্তরসীমা মুরশিদাবাদ।
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগিরথী খাদ॥
দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার।
পূর্ব্বসীমা ধূল্যাপুর বড়গঙ্গা পার॥
ফরমানী মহারাজ মনস্‌বদার।
সাহেব নহবৎ আর কানগোই ভার॥
কোঠার কাঙ্গুরা ঘড়ী নিশান নহবৎ।
পাতশাহী শিরপা সুলতানী সুলতনৎ॥
ছত্র দণ্ড আড়ানী চামর মোর ছল।
সরপেচ মোরছী কালগী নিরমল॥
দেবীপুত্র নামে রাজা বিদিত সংসারে।
ধর্ম্মচন্দ্র নাম দিলা নবাব যাহারে॥
সেই রাজা এই অন্নপূর্ণার প্রতিমা।
প্রকাশিয়া পূজা কৈলা অনন্ত মহিমা॥
কবি রায় গুণাকর খ্যাতি নাম দিয়া।
ভারতেরে আজ্ঞা দিল গীতের লাগিয়া॥
অন্নপূর্ণা ভারতেরে রজনীর শেষে।
স্বপনে কহিলা মাতা তার মাতৃবেশে॥
অরে বাছা ভারত শুনহ মোর বাণী।
তোমার জননী আমি অন্নদা ভবনী॥
কৃষ্ণচন্দ্র অনুমতি দিলেন তোমারে।
মোর ইচ্ছা গীতে তুমি তোষহ আমারে॥
ভারত কহিলা আমি নাহি জানি গীত।
কেমনে রচিব গীত একি বিপরীত॥

অন্নদা কহিলা বাছা না করিহ ভয়।
আমার কৃপার বলে বোবা কথা কয়॥
গ্রন্থ আরম্ভিয়া মোর কৃপা সাক্ষী পাবে।
যে কবে সে হবে গীত আনন্দে শিখিবে॥
এত বলি অমৃতায় মুখে তুলি দিল।
সেই বলে এই গীত ভারত রচিল॥''

পূর্ব্বোদ্ধৃত কবিতার প্রথমাংশে যে সমস্ত ব্যক্তির নামোল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহারা সকলেই রাজপরিবারভুক্ত তদ্ব্যতীত যে সমস্ত ব্যক্তি উল্লিখিত হইয়াছেন তাঁহারা তাৎকালিক রাজসংস্কারস্থ প্রধান কর্ম্মচারী। কবি বা পণ্ডিতের নামে যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা অসম্পূর্ণ। এ যাবৎ এই সকল ব্যক্তি যত জনার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা লিপি-বদ্ধ করিতে হইলে বহুস্থানের আবশ্যক সেইজন্য তাঁহার সভাস্থ কতিপয় প্রধান কবি ও পণ্ডিত মাত্রের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে প্রদত্ত হইল।

বঙ্গ-কবিকুলরবি ভারতচন্দ্র

ইনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতি ভুরসুট পরগণার পাণ্ডুয়া বসন্তপুর গ্রামের সন্নিহিত নরেন্দ্রপুরের বদান্য ভূস্বামী রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পুত্র। ইহাঁদের বংশের উপাধি মুখোপাধ্যায়। লক্ষ্মীশ্রী থাকায় রায় বা রাজা নামে অভিহিত ছিলেন। ভারতরা তিন সহোদর তন্মধ্যে ভারত সর্ব্ব-কনিষ্ঠ। তিনি বাল্যকাল হইতে অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। মাত্র চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে ইনি সংক্ষিপ্তসার নামক জটিল ব্যাকরণ আরম্ভ করেন। মুসলমান ভাব ভাষা প্লাবিত তদানীন্তন বাঙ্গালায় সংস্কৃত অপেক্ষা পারশীর আদর অধিক ছিল; সুতরাং ভারতের সংস্কৃতানুরাগ তাঁহার পিতা ও অন্য আত্মীয়ের নিকট বিরাগের কারণ হইয়া উঠে সুতরাং বাধ্য হইয়া তিনি পারশী অধ্যয়নে মন দেন এবং অল্পদিনেই উহাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এই সময়ে বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তি-চন্দ্রের মাতা তাঁহার পিতার তালুক বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়ায় তিনি গাজীপুর যাইয়া অতি কষ্টে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। পরে ইনি তদানীন্তন চন্দননগরের ফরাশী গভর্ণমেন্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণের আশ্রয়প্রাপ্ত হন। ইনি চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে সুললিত ভাষায় ছন্দে দুইখানি সত্যনারায়ণের পুঁথী রচনা করেন। ইন্দ্রনারায়ণই ১১৫৯ সালে তাঁহাকে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত পরিচয় করিয়া দেন। প্রথমে ইনি প্রত্যহ একটী করিয়া ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়া রাজাকে উপহার দিতেন গুণগ্রাহী মহারাজা তাঁহার সর্ব্ব অবয়ব সম্পন্ন ভাব ভাষা ও ছন্দবন্ধের উন্নত প্রণালী দৃষ্ট করিয়া তাহাকে কবিকঙ্কণ চণ্ডীর অনুরূপ পালাকারে অন্নদামঙ্গল গ্রন্থ রচনা করিতে আদেশ করেন। ভারত স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে এই গ্রন্থ রচনাপূর্ব্বক কৌশলে মানসিংহ ও বিদ্যাসুন্দর ও মানসিংহ উপাখ্যান

নামক গ্রন্থ তিনখানি উহাতে সংযুক্ত করিয়া দেন। গুণবোদ্ধা মহারাজা এই অপূর্ব্ব সুরমান কাব্যামৃতরসাস্বাদ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "গুণাকর" এই সম্মানজনক উপাধি ভূষিত করিয়া বার্ষিক ৬০০৲ টাক করধার্য্যে মুলাযোড় গ্রামে বহু সম্পত্তি ইজারা দিয়া সস্ত্রীক ভারতকে তথায় বাস করাইয়াছিলেন। এই সময়ে বর্গীর উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া বৰ্দ্ধমানাধিপতি তিলকচন্দ্রের মাতা সপুত্র মুলাযোড়ের কাউগাছি গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এইখানে বাস কালে পাছে তাঁহার হয় হস্তি গবাদি ব্রাহ্মণ ভারতের ইজারা লওয়া সম্পত্তিতে খাইয়া বৃক্ষাদি নষ্ট করিয়া অত্যাচার করে তাহাতে পাছে "ব্রহ্মণ্য" অপহরণের দোষ স্পর্শে সেই ভয়ে নবদ্বীপাধিপতির নিকট আপনার কর্ম্মচারী কামদেব নাগের নামে মুলা-যোড় গ্রামখানি পত্তনি লইলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বৰ্দ্ধমানাধিপতির এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা না শুনিয়া থাকিতে পারিলেন না তাই তিনি ভারতের সম্পত্তি লইয়া ও যদি অতঃপর ভারত কোন কারণে মুলাযোড়ে বাস করিতে অনিচ্ছুক হন তবে আনরপুরের অন্তঃপাতি গুস্তে গ্রামে তাঁহার বাসের জন্য একশত পাঁচ বিঘা ও মুলাযোড়ে ষোল বিঘা জমি ব্রহ্মোত্তর স্বরূপ প্রদান করেন। কিন্তু মুলাযোড়ের সমস্ত লোকের অনুরোধে তিনি মুলাযোড়েই বাস করিতে বাধ্য হন।

এদিকে রামনাগ পত্তনি লইয়া গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। ভারত তাঁহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া ও স্বয়ং রাগের দংশনে পীড়িত হইয়া অষ্টশ্লোকাত্মিক নাগাষ্টক নামক এক অপূর্ব্ব কবিতা রচনা করিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সমীপে প্রেরণ করেন। উহা পাঠে রাজা অচিরাৎ নাগের বিষদন্ত ভগ্ন করিয়া দেন।

ভারত পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ চতুষ্টয় ব্যতীত "রসমঞ্জরী" সত্যনারায়ণের ব্রত কথা অসম্পূর্ণ চণ্ডিনাটক ও বহু সংস্কৃত, পারশী, উর্দ্দূ ও বাঙ্গালা কবিতা

রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৬৬৪ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৬৮২ শকে বা ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে লোকান্তর গমন করেন।

সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ সেন

১৭২৩ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাতীরবর্ত্তী কুমারহট্ট গ্রামে বৈদ্যবংশে রামপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। কুমারহট্টের বর্ত্তমান নাম হালিসহর। উহা তখন কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারভুক্ত ছিল এবং বাঙ্গলার একটী বিখ্যাত সমাজ বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। তাহার পিতার নাম রামরাম সেন। দরিদ্র হইলেও তিনি পুত্রকে সুশিক্ষা দান করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদও বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পারস্য ও হিন্দি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আবাল্য তাঁহার কবিপ্রতিভা ও ধর্ম্মানুরক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভেই পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তাঁহাকে সমস্ত চর্চ্চা ত্যাগ করিয়া পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্ত চাকুরীর চেষ্টা করিতে হয় এবং কোনও ধনীর * গৃহে আশ্রয় লাভ করেন। কথিত আছে তিনি চাকুরী করিতে যাইয়া ভাবাবেশে হিসাবের খাতায় শ্যামা বিষয়ক সঙ্গীত সমুদয় লিখিয়া রাখায় তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী তদ্দৃষ্টে কুপিত হইয়া এই ব্যাপার মনিবের গোচর করিলে গুণগ্রাহী মনিব এই অপূর্ব্ব সঙ্গীতগুলি পাঠ করিয়া বিশেষতঃ তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গীত ;—

প্রসাদীসুর—তাল একতালা।

আমায় দাওমা তবিলদারী।
আমি নিমক হারাম নই শঙ্করী।
পদ-ভাণ্ডার সবাই লুটে,
ইহা আমি সইতে নারি।

* এই ধনী ব্যক্তির নাম এ পর্য্যন্ত স্থির নিশ্চয় জানা যায় নাই। জনশ্রুতি ওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের গৃহেই কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন।

ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা,
সে যে ভোলা ত্রিপুরারি
শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা,
তবু জিম্মা রাখ তাঁরি।
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গির তাঁর
তবু শিবের মাইনে ভারি॥
আমি বিনা মাইনের চাকর
চরণধূলার অধিকারী,
যদি তোমার বাপের ধারা ধর,
তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর
তবে তো মা পেতে পারি॥
প্রসাদ বলে অমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি
ও পদের মত পদ পাইতো,
সে পদ ল'য়ে বিপদ সারি॥

এই গীতটী পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়া সেই দিন হইতে রামপ্রসাদের চাকুরী ত্যাগ করাইয়া মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। বৃত্তি লাভ করিয়া তিনি সংসারের ভাবনার হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া একাগ্রচিত্তে শক্তি সাধনয়ে নিযুক্ত হইলেন এবং নিজগ্রামে তন্ত্রোক্ত পঞ্চমুণ্ডী আসন স্থাপন করিয়া তপঃ সিদ্ধ হইলেন। এই আসন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে এবং এই সিদ্ধ মহাপুরুষের সম্বন্ধে কত অলৌকিক কিম্বদন্তী প্রচলিত রহিয়াছে কথিত আছে জগন্মাতা তাঁহার কন্যারূপ ধরিয়া একদিন তাহার বেড়া বাঁধায় সাহায্য করিয়াছিলেন। একদিন প্রসাদ কোনও মন্দিরের পশ্চাৎভাগের নিজ রচিত গীত গাহিতেছিলেন জগন্মাতা ভক্তেই সেই গীত শুনিতে বা

তন্ত্রের জয়ঘোষণা করিতে মন্দির শুদ্ধ তাঁহার দিকে ফিরিয়াছিলেন। যাহাই হউক তদানীন্তন সমাজে প্রসাদের কিরূপ খ্যাতি ব্যাপ্ত হইয়াছিল, এই সকল গল্পে তাহাই পরিস্ফুট; গুণগ্রাহী নদীয়াধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই কালে তাঁহার অধিকারস্থ কুমারহট্টে প্রায়ই আসিতেন, ও গঙ্গাবাস করিতেন, একদিন তিনি প্রাসাদের অনুপম ও কণ্ঠসঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া প্রসাদকে "কবিরঞ্জন" উপাধি ও একশত বিঘা ব্রহ্মোত্তর দান করেন ও তাঁহাকে স্বীয় সভাসদ্‌পদে বরণ করেন। প্রসাদও কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মহারাজকে ভারতচন্দ্রের ন্যায় বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থ রচনা করিয়া উপহার দেন। এই রচনা অপেক্ষা সঙ্গীত-সাধনাই রামপ্রসাদের নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছে। তাঁহার রচিত সঙ্গীতাবলীর তিনি এক নূতন সুর সংযোগে গান করিতেন এবং ঐ সুর অদ্যাপি "প্রসাদী" সুর বলিয়া খ্যাত ও বাঙ্গালীর ত্রিতাপ-তপ্ত হৃদয়ে সুধাবর্ষণ করিতেছে। কথিত আছে নবাব সিরাজদ্দৌলা তাঁহার গানে মুগ্ধ হইয়া হালিসহর নামিয়াছিলেন। তিনি কতদিন জীবিত ছিলেন, তাহা সঠিক জানা যায় না, শুনা যায় শ্যামাপূজার পরদিন প্রতিমা বিসর্জ্জনের সময় গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া তাহার প্রসিদ্ধ শেষ গানটী * গান

---

* রাগিণী সুরটান—তাল একতালা।

তারা তোমার আর কি মনে আছে।

ওমা এখন যেমন রাখ্‌লি সুখে

তেম্নি সুখ কি পাছে।

শিব যদি হন সত্যবাদী,

তবেকি মা তোমায় সাধি,

মাগো ওমা ফাঁকির উপরে ফাঁকি,

ডান চক্ষু নাচে।

করিতে করিতে যখন শেষ চরণে "মাগো ওমা আমার দফা হ'ল রফা দক্ষিণা হয়েছে" বলিয়া উচ্চকণ্ঠে গগন নিনাদিত করিয়া তুলিলেন সেই সময় তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। মৃত্যুকালে তাঁহার রামদুলাল ও রামমোহন নামে দুই পুত্র ও পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী নাম্নী দুই কন্যা জীবিত ছিলেন।

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার

হুগলী জেলার অন্তর্গত সুবিখ্যাত গুপ্তপল্লী গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে বাণেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামদেব তর্কবাগীশ। তিনিও একজন শাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিত ছিলেন। বাণেশ্বর পিতার নিকটেই বিদ্যালাভ করেন। পরে নিজ যত্নে সবিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া দেশবিখ্যাত হয়েন। বাণেশ্বরের বাল্যকালে এক কৌতুকাবহ গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে, একদিন শ্যামাপূজার রজনীতে একজন পণ্ডিত সন্ন্যাসী

আর যদি থাকিত ঠাই,
তোমারে সাধিতাম নাই,
মাগো ওমা দিয়ে আশা,
কাট্‌লে পাশা তুলে দিয়ে গাছে॥
প্রসাদ বলে মন দড়,
দক্ষিণায় জোর বড়,
মাগো ওমা আমার দফা হলো রফা
দক্ষিণা হয়েছে।

তাঁহাদের চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া যদৃচ্ছাক্রমে শ্যামাশক্তির স্তবাত্মক অষ্টাবিধ শত সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। উপস্থিত সকলে সেই ভক্ত সন্ন্যাসীর ভক্তিরসাত্মক অপূর্ব্ব শ্লোক শ্রবণে মোহিত ও আর্দ্র হইয়া ঐ সুন্দর শ্লোক-মালা কেহ লিপিবদ্ধ করিলে ভাল হইত বলিয়া আক্ষেপ করিলে বালক বাণেশ্বর "আমি উহা কণ্ঠস্থ করিয়াছি" বলিয়া তৎক্ষণাৎ অবিকল আবৃত্তি করিলেন। তাঁহার পিতা পুত্রের এই অনন্য সাধারণ মেধা দেখিয়া বলিলেন, "কালে বাণুও পণ্ডিত হবে।" পিতার সেই ভবিষ্যদ্বাণী পুত্রের জীবনে পরিস্ফুট হইয়াছিল। উপস্থিত মতে মুখে মুখে শ্লোক রাথায় তাঁহার কালে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। এই গুণে ও তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যে তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের সভার একজন আদরণীয় সভাসদ হইয়াছিলেন এবং রাজাও তাঁহাকে স্বীয় গুরুর ন্যায় সম্মান করিতেন ও তিনি আসিলে গাত্রোত্থান করিয়া সম্ভ্রম প্রদর্শন করিতেন, এ সম্বন্ধে এক কৌতুকাবহ সুন্দর কাহিনী আছে। কথিত আছে মহারাজার সভায় কোনও সময়ে একজন রত্নবণিক রত্নবিক্রয়ের জন্য আসিয়া রত্ন সম্বন্ধে অনন্য সাধারণ গুণপণা প্রদর্শন করিলে গুণগ্রাহী রাজা তাহাকে নিজ সভায় স্থান দেন। ক্রমে ঐ ব্যক্তি নিজ অন্যান্য গুণে রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠে ও সেই গৌরবে সকলকে তাচ্ছিল্য করিতে থাকে। একদিন রাজা যখন পূজান্তে বসিয়া ঐ ব্যক্তির সহিত আলাপ করিতেছিলেন, তখন পূজনীয় বাণেশ্বর সেইখানে আসিলে রাজা তাঁহাকে সম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক সম্মুখস্থ কুশাসন দেখিয়া "ইদং কুশাসনম্" বলিয়া বসিতে অনুরোধ করিলে পণ্ডিত পার্শ্ববর্ত্তী রত্নবণিককে তাঁহার আগমন সত্ত্বেও বসিয়া থাকিতে দেখিয়া রাজার প্রতি "ইদম্ কুশাসনম্" বলিয়া সে স্থান ত্যাগ করেন। বুদ্ধিমান্ রাজাও তদবধি ঐ রত্নবণিকের প্রগল্ভতায় বিরক্ত হইয়া তাহার সঙ্গত্যাগ করিয়া সুশাসনের পরিচয় প্রদান করিলেন।

বাণেশ্বরের সম্বন্ধে এইরূপ বহু গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে একদিন তিনি রাজার সহিত নৌকারোহণে ভাগিরথী বাহিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। ত্রিবেণী অতিক্রম করিয়াই রাজা প্রশ্ন করিলেন এখানে ভাগীরথীর বেগ এত মন্দ কেন? তদুত্তরে বিদ্যালঙ্কার তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন,

"সাগর সন্ততি সন্তরণেচ্ছয়া প্রচলিতাতিজবেন হিমালয়াৎ।
ইহঃ হি মন্দমুপৈতি সরস্বতী যমুনায়া বিরহাদিব জহ্নবী॥

অর্থাৎ ভাগীরথী সগর সন্তানগণের উদ্ধার বাসনায় সরস্বতী ও যমুনা নাম্নী সখীদ্বয়ের সঙ্গে হিমালয় হইতে অতি বেগে গমন করিতেছিলেন এই স্থানে ঐ সখীদ্বয়ের সহিত বিরহ নিবন্ধন তিনি মন্দগামিনী হইয়াছেন।

একদা রটন্তী পূজার রজনীতে মহারাজা কোনও কারণে "কিমদ্ভুতম্' বাক্য প্রয়োগ করিলে বানেশ্বর তাহা এইরূপে পূরণ করেন,—

"শিবস্ত নিন্দয়া তু যাত্যযদ্ বপুঃ স্বকীয়ম্।
তদস্য পঙ্কজদ্বয়ঃ শবে শিবে শিবে কিমদ্ভুতম্॥"

অর্থাৎ যিনি শিবের নিন্দা শুনিয়া আপনার দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন সম্প্রতি তাঁহার পদদ্বয় সেই শবাকার শিবে সংস্থাপিত হইয়াছে ইহাই অদ্ভুত।

কৃষ্ণচন্দ্র তাহার মাতার যে মহতী ঘটা করিয়া আদ্যশ্রাদ্ধ করেন তদুপলক্ষে দানসাগরকালে হয় হস্তী যান বাহনাদি দান করিতে বসিয়া দেখিলেন যে সত্বস্নাত হস্তীগুলি কাঁপিতেছে ও তাহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে উপস্থিত সকলেই শৈত্যাধিক্য বশতঃ কাঁপিতেছে এইরূপ বলিলেন কিন্তু সুকবি বাণেশ্বর উত্তর করিলেন,—

"হস্তন্যস্তকুশোদাকে ত্বয়ি ন ভূঃ সর্বংসহা কম্পতে
দেবাগ্রতস্তৈব কাঞ্চন গিরিশ্চস্তে ন বত্তে ভয়ম।

অজ্ঞাতদ্বিপ ভক্ষ্যাভিক্ষুভবন প্রস্থানত্রস্থাশয়া
বেপন্তে মদদন্তিনঃ পরমমী ভূমিপতে তাবকাঃ ॥

বাণেশ্বর প্রথম জীবনে নবাব আলীবর্দ্দীর সভায় বহুমান্য সভাসদ্ ছিলেন ; পরে নবাবের মৃত্যুতে নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ হয়েন পরে কোন কারণে তাঁহার বিরাগভাজন হইয়া শোভাবাজার রাজাদের পূর্ব্বপুরুষ তাৎকালিক উদীয়মান রাজা নবকৃষ্ণের আশ্রয় পান। কিন্তু কোথাও থাকিয়া মনের শান্তি অনুভব করিতে না পারিয়া একদা নিম্ন-লিখিত শ্লোকে আত্মনিবেদন করেন,—

আলিবর্দ্দিনবাবমপ্যং নবদ্বীপেশ্চয়াঙ্কাশ্রিতং
তপেশ্চায়বকৃষ্ণভূপতিম মুং রে চিত্তবিত্তশয়া।
সর্ব্বত্রৈব নবেভিশব্দঘটিতং ত্বক্তেং কমালম্বসে
তদ্ দেবং পরার্থদং নবঘনশ্যামং কমংমুঞ্চসি।''

এইরূপ শত শত কবিতায় তাঁহার অনন্যসাধারণ কবিপ্রভার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইকালে বাণেশ্বরের যশঃ দেশবিখ্যাত হয় এবং তদানীন্তন কালের কলিকাতার শ্রেষ্ঠ ধনী রাজা নবকৃষ্ণের সভায় ও বর্দ্ধমান রাজসভায় সমাদৃত হয়েন। কেহ কেহ বলেন নবকৃষ্ণের অনুরোধে তিনি কলিকাতায় আদিম অধিবাসী বসাকদিগের বাটীতে কোন শ্রাদ্ধীয় সভায় গমন করায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার এই কার্য্যে বিরক্তি প্রকাশ করিলে তিনি কৃষ্ণনগর ত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমান রাজসভার প্রধান পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন।

রাধারমণ গোস্বামী

ইহাঁর নিবাস শান্তিপুর। ইনি একজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন ও মহারাজা তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। কথিত আছে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় কোনও সময়ে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতারবাদ লইয়া অত্যন্ত বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হইলে এই রাধারমণ গোস্বামী হস্তলিপির অনুষ্ঠান দ্বারা একটী নিরক্ষর শিশুর হস্তলিপির দ্বারা সর্ব্বসমক্ষে নিম্নলিখিত শ্লোকটী প্রাপ্ত হয়েন।

"চৈতন্য ভগবৎভক্ত নচ পূর্ণ নচাংশক"

চৈতন্যদ্বেষী পণ্ডিতগণ ইহার অর্থ করেন যে "চৈতন্য পূর্ণ বা অংশ নহেন তিনি ভগবতভক্ত, কিন্তু ভক্ত রাধারমণ ইহার ব্যাখ্যা করেন "চৈতন্য ভগবতভক্ত নহেন অংশও নহেন পূর্ণ।" কথিত আছে উপস্থিত নিরপেক্ষ পণ্ডিতমণ্ডলী রাধারমণের ব্যাখ্যার্থ গ্রহণ করেন। প্রবাদ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র চৈতন্য-সম্প্রদায়ীগণের উপর বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন; সেজন্য একদিন একজন বৈষ্ণব পণ্ডিত তাঁহাকে কৌতুক করিয়া বলেন যে মহারাজার এই শ্রীচৈতন্য বিদ্বেষ শাস্ত্র সিদ্ধ কেন না যখন ভগবান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন তখনই তাঁহার জন্মস্থানের পরপারস্থ রাজার হিংসা উদ্রিক্ত হইয়াছে। ত্রেতায় রামচন্দ্র অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করিলে সমুদ্রপারস্থ রাবণের দ্বেষ হইয়াছিল দ্বাপরে ভগবান গোকুলে অবতীর্ণ হইলে পরপারস্থ মথুরাধিপতি কংশের বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন সুতরাং কলি-তেই বা সেই সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম কেন হইবে। ভগবান যখন নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তখন গঙ্গাপারস্থ আপনার চৈতন্য বিদ্বেষ সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত।

মুক্তিরাম মুখোপাধ্যায়

ইহার নিবাস উলাগ্রাম। তাঁহার সহিত রাজার বিশেষ সম্পর্ক ছিল না; রসিকবিধায় রাজা তাঁহাকে বৈবাহিক সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতেন। অন্নদামঙ্গলগ্রন্থে ভারতচন্দ্র তাঁহাকে মুক্তিরাম মুখুয্যা গোবিন্দ ভক্তদড় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উলায় তাঁহার বিশেষ সম্ভ্রম ছিল। তাঁহারই উদ্যোগে মহারাজা প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে উলায় নিজ স্থাপিত দীর্ঘকায় ভগবানের উদ্দেশে প্রতিদিন লক্ষ পদ্মফুল উৎসর্গ করিতেন। তাঁহার হাস্য পরিহাসের শত শত গল্প এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে। এখানে কয়েকটী লিখিত হইল। উলার কোনও দুষ্ট লোক কৌশলে অন্য এক ব্যক্তির বালিকা স্ত্রী বিক্রয় করাতে রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন "বেহাই তোমাদের ওখানে নাকি বৌ বিক্রী হয়?" তিনি উত্তর করেন "হাঁ মহারাজ নিয়ে যাওয়া মাত্রে"। মুক্তরাম একদিন মহারাজকে কয়েকটী মাগুর মাছ উপহার দেন। আহারানন্তর রাজা তাঁহাকে বলেন "বেহাই, তুমি যাহা পাঠিয়েছিলে তাহার অন্ত নাই" তিনি বলিলেন "মহারাজ, উহার আদি অন্ত দুইই ছিল না।" রাজা একদিন প্রত্যূষে তাঁহাকে দেখিয়া বলেন "বেহাই গত রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছি যেন আমরা দুইজনে বেড়াইতে বেড়াইতে একস্থানে যেয়ে তুমি বিষ্ঠার হ্রদে, আমি পায়সের হ্রদে পড়িয়াছি" তিনি উত্তর করিলেন "মহারাজ আমিও গত রজনীতে ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি কেবল বিশেষ এই, যেন হ্রদদ্বয় হইতে উত্থান করিয়া আমরা পরস্পর গাত্র লেহন করিতেছি। মুক্তিরামের বংশাবলী অদ্যাপি উলাতে আছেন।

গোপাল ভাঁড়

ইনি নরসুন্দর বংশীয়। ইহার পূর্ব্বনিবাস শান্তিপুর কিন্তু রাজসভার সংশ্রবে আসিয়া কৃষ্ণনগর ঘূর্ণিতে স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। গোপালের সরস বাক্যচাতুর্য্যের বিষয় আজিও বাঙ্গালায় আবালবৃদ্ধ বনিতার পরিচিত সুতরাং এখানে তাঁহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে মহারাজার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কি মধুর ছিল তাহা দেখাইবার জন্য এখানে একটী মাত্র গল্প লিখিত হইল, একদিন মহারাজা গোপাল ও অন্য দুই জন বয়স্যকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে গাত্রস্থ শালখানি খুলিয়া গোপালের গায়ে নিক্ষেপ করিলেন, তদৃষ্টে অপর পারিষদ দুইটীও নিজ নিজ গাত্রবস্ত্র গোপালের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিলেন। তখন কৌতুকী মহারাজ বলিলেন, গোপাল! এ যে দেখছি একটা গাধার মোট হ'ল" গোপাল তৎক্ষণাৎ সপ্রতিভ ভাবে উত্তর করিল; "আজ্ঞে একটা নয় তিনটা গাধার মোট।"

কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের সমাজ।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের যুগ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংযোগ স্থল। এই কালে পাশ্চাত্য জাতীয়গণ এদেশে আসিয়া সমধিক প্রভাব বিস্তার করায় তাঁহাদের আদর্শ তখনই গৃহীত না হইলেও বাঙ্গালীর সম্মুখে উহা স্থাপিত হয় ও ক্রমে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মধ্যে শনৈঃ শনৈঃ তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। সুতরাং এই কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ কি আমরা পূর্ব্বতম বাঙ্গালী নিজস্বভাবের শেষ পরিচ্ছেদ বলিতে পারি। এই সময়ের বহুশত বর্ষ পূর্ব্ব হইতে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক এদেশ বিজিত হইলেও বাঙ্গালী আহার, বিহার, রীতি, নীতি, ধর্ম্মে, কর্ম্মে তাহার বাঙ্গালীত্ব একেবারে ভুলিয়া যায় নাই, কারণ দেশের মূলশাসক মুসলমান হইলেও প্রত্যক্ষতঃ বাঙ্গালী হিন্দু-ভূস্বামীগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। দেশের রাজা মুসলমান প্রায়শঃই সকল ভূস্বামীগণের নিকট যথাকালে করগ্রহণে সন্তুষ্ট হইয়া নিজের বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিতেই ব্যস্ত রহিতেন। দেশের বা সমাজের আভ্যন্তরীন্ কোন বিষয়ের সহিত বিলাসভাবে লিপ্ত হইতেন না। সুতরাং দেশের ও সমাজের প্রকৃত কর্ত্তা ছিলেন ঐ সকল ভূস্বামীগণ। এইরূপে যে কয়েকজন বাঙ্গালী ভূস্বামী বাঙ্গালা শাসন করিতেন নদীয়া রাজবংশে বিশেষ ঐ বংশীয় ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তদানীন্তন বাঙ্গালীর মধ্যে ও বাঙ্গালা সমাজে তাঁহার প্রভাব অশেষ বিস্তীর্ণ। মহারাজা ভারতচন্দ্র কর্ত্তৃক চারি সমাজের পতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, চক্রদ্বীপ, বর্ত্তমান চাকদহ ও কুশদ্বীপ বর্ত্তমান কুশদহ চারি সমাজ বলিয়া খ্যাত ছিল। যদিও উক্ত

চারিটী সমাজ ও স্থান নদীয়া রাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সমাজ ও স্থান বলিয়া খ্যাত ছিল, কিন্তু ভট্টপল্লী, কুমারহট্ট, উলা, শান্তিপুর, ফুলে প্রভৃতি সমাজের প্রসার ও জন সংখ্যা কম ছিল না। বিশেষ শান্তিপুর তদ্‌পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে ওতদঞ্চলের কুলীন প্রধান স্থান ও সামাজিক কেন্দ্র বলিয়া খ্যাত। এখানে সভায় আহ্বান করিলেই সর্ব্বস্থানের সভা আহুত বলিয়া গণ্য হইত। তখন চক্রদ্বীপ আচন্বিতা নামে জমিদারী কাগজপত্রে খ্যাত ও উহা দেবীবরের স্বষ্ট ছত্রিশ মেলের মধ্যে এক মেল আচম্বিতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। আবার কেহ কেহ বলেন মহারাজ নদীয়া, কুমারহট্ট, শান্তিপুর এবং ভট্টপল্লী এই চারি সমাজের পতি ছিলেন। মহারাজ তাঁহার রাজ্যস্থ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতি সমুদয়ের সমাজপতি ছিলেন। তাঁহার রাজ্যস্থ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, নবশায়ক ও কায়স্থ, এই প্রবল জাতি চতুষ্টয় তদানীন্তন হিন্দু ধর্ম্মের চারিটী স্তম্ভস্বরূপ ছিল, আর তিনি ছিলেন তাঁহাদের চূড়া। তাঁহার অধীনস্থ প্রদেশের পূর্ব্বোল্লিখিত বর্ণচতুষ্টয়ের উপর এমন কি বিধর্ম্মীর সমাজের উপরও অবিসম্বাদিত প্রভুত্ব ছিল। তিনি শাস্ত্রানুমোদিত যে কোনও ব্যবস্থা করিতেন তাহাই তখন বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র আদরের সহিত পরিগৃহীত হইত। জাতিচ্যুতি ও জাতিদান বা সামাজিক বিধি নিষেধ প্রণয়নে তিনি সম্পূর্ণ অধিকারী হইলেও হিন্দুশাস্ত্র বিগর্হিত বা সনাতন নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য কোন অবস্থাতে কখনই অনুমোদন করিতেন না। এই কালে কৃষ্ণনগরের কোনও ব্রাহ্মণ সন্তানকে কোনও দুরাচার বলপূর্ব্বক এক ফোটা গোমাংসের ঝোল মুখে দিলে অন্যের কথা কি তদানীন্তন বাঙ্গালার সর্ব্বময় কর্ত্তা বাঙ্গালী বিজয়ী লর্ড ক্লাইভ সাহেবের আন্তরিক যত্নে ও কৃষ্ণচন্দ্রের শাসিত ব্রাহ্মণ সমাজে উহার প্রায়শ্চিত্তের উপায় বিধান হয় নাই। অভাগা ভগ্নহৃদয়ে আত্মহত্যা করে। তদানীন্তন নবাবের দক্ষিণ বাহু রাজা রাজবল্লভের বিধবা কন্যার বিবাহ বিধান

সামাজিক নিয়ম বিরুদ্ধ বলিয়া তিনি কৌশলে উহা ব্যর্থ করেন। ধর্ম্ম কর্ম্মের কোনও সংশয় উপস্থিত হইলে বঙ্গদেশের অন্য প্রদেশস্থ রাজারাও তখন তাহার মত লইয়া চলিতেন। নবদ্বীপের পঞ্জিকা তখন জগৎ বিখ্যাত ও তাহা নবদ্বীপাধিপতি কর্ত্তৃক অনুমোদিত বলিয়া তুলোট কাগজে লিখিত হইয়া প্রধান প্রধান ব্যক্তির নিকট প্রেরিত হইত।

তাঁহার দৃষ্টান্তে আজ চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দেশব্যাপ্ত; তাঁহারই আদেশে তাঁহার অধিকার মধ্যে একবার এক রাত্রিতে এক লক্ষ শ্যামাপূজার অনুষ্ঠান হয়। শুনা যায় এই রাত্রে একজন লোভী ব্রাহ্মণ বহু সংখ্যক পূজা করিয়া মহারাজের নিকট শাস্তিলাভ করে। তিনি শিবনিবাসের বাটীতে একবার লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি লাভের আশায় বিপুল ব্যয়ে মহান্ অনুষ্ঠান করেন ও ভূরি পরিমাণ দানে সকলকে সন্তুষ্ট করেন। এই সময়ে শ্রীমান্ হিন্দুমাত্রেই কোনও না কোনও পূজার অনুষ্ঠান করিতেন। একটু অবস্থা স্বচ্ছল হইলেই সর্ব্বাগ্রে এককালীন চণ্ডীমণ্ডপ বা শিবলিঙ্গ স্থাপনা করিতেন। মহারাজা নদীয়ার বহুস্থানে গ্রাম পত্তন করিয়া দেবতা স্থাপন ও দেবোত্তর দান করিয়া গিয়াছেন। ভক্তিমান্ হইলে বা যে কোন গুণ থাকিলেই মহারাজা মুক্তহস্তে তাহাকে ধন বা ভূমি দান করিতেন।

এই ভূমিদানের পরিমাণ এই রাজার সময়ে এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে তাঁহাদের জমিদারীর চতুর্থাংশ ভূমি নিস্কর ছিল এ প্রদেশে যে ব্রাহ্মণের রাজদত্ত নিস্কর নাই তিনি ব্রাহ্মণের মর্য্যাদাই প্রাপ্ত হয়েন না। কেবল যে ব্রাহ্মণই ভূমি দান পাইতেন তাহা নহে বা দানের পরিমাণও নির্দ্দিষ্ট ছিল না। কুটুম্ব বা অধ্যাপক বিশেষকে কখনও কখনও সমগ্র গ্রাম নিস্কররূপে প্রদত্ত হইত। ব্রাহ্মণেতর গুণী হইলেও মহত্রাণ দান পাইতেন। মহারাজা তাঁর দুই রাণীকে বহু ভূমি ও গ্রাম নিস্কর দান করিয়াছিলেন। এই

সকল সম্পত্তি খাঁড়কীর সম্পত্তি ও বড়রাণীর সম্পত্তি বড় দেউড়ী ও ছোট-রাণীর সম্পত্তি ছোট দেউড়ি নামে খ্যাত। অধিকারস্থ প্রতি গ্রামে গাজনের শিব ও দোক অর্থাৎ চড়কের ব্যয়ের জন্য ভূমি প্রদত্ত হইত। এতদ্ব্যতীত রাজ সংসারের অনেক ভৃত্য চাকরাণ নিষ্কর বৃত্তি ভোগ করিত। এইরূপ দানের পরিমাণ একরূপ অপরিমেয়; সুতরাং তাহার অধিকারে তথা তাঁহার সভায় গুণীজ্ঞানীর সর্ব্বদা সমাবেশ হইত ও দূর দূরান্তর হইতে তাঁহারা আসিয়া এ রাজ্যে বাস করিতেন।

শিক্ষার বিস্তৃতির জন্যও রাজার পরম যত্ন ছিল। নিজের যত্নে রাজ-কুমারগণও উত্তম সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। সে সময় নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, কামালপুর, কুমারহট্ট, শান্তিপুর, গুপ্তা, বহিরগাছি, বিল্বপুষ্করিণী, বিল্বগ্রাম প্রভৃতি সমাজস্থলে বহু টোল চতুষ্পাঠী ছিল। এতদ্ব্যতীত বহু গ্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টোল ছিল। এই সকল শিক্ষিত লোকের চাকরী অপেক্ষা কৃষিই তখন প্রধান অবলম্বন ছিল। সহরে, নগর সরকারে, রাজ সংসারে বা গ্রামস্থ প্রধানের বাটীতে মুহুরী প্রভৃতির কার্য্যে বহুলোক নিযুক্ত ছিল এবং রাজসংসারে সদর কাছারীতে ন্যূনাধিক চারিশতেরও অধিক কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহাদের বেতনও অধিকাংশ স্থলে ৫।৬ টাকা ছিল। তাহাতেই ভরা পেটে হাসিমুখে সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করিত। এইকালে দ্রব্যাদির মূল্যও অত্যন্ত সুলভ ছিল।

এই কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে লোকে যথার্থই ভোজনবিলাসী ছিল। অলঙ্কারি ভাব ও ভাষায় যেরূপ মুসলমানী ভাব প্রবেশ করিতেছিল তেমনি আহার্য্য তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে যাবনিক আহার্য্যের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাই; কথিত আছে স্বয়ং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভোজনবিলাসীগণের অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার নিমিত্ত প্রত্যহ নানাবিধ, সুস্বাদু, চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয়াদি প্রস্তুত হইত; তিনি তাহা হইতে যথেচ্ছা গ্রহণ করিতেন। "হৈয়ঙ্গ বীন"

অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণের গাভী প্রত্যুষে দোহন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার ননীভাগ গ্রহণ করিয়া সদ্য যে ঘৃত প্রস্তুত হয় তিনি প্রত্যহ তাহাই ব্যবহার করিতেন। অন্নদামঙ্গলে আমরা এই সময়ের একটী লোভনীয় রসনা আদ্রকর আহার্য্য তালিকা দেখিতে পাই।*

অন্ন, ডাল, নিরামিষ, ব্যঞ্জন, মৎস্য, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, সচরাচর ব্যবহৃত হইত। শাক্ত সম্প্রদায়ী লোকে কখনও কখনও মাংস ভোজন করিতেন কিন্তু এই ছাগ শক্তির উদ্দেশে ছিন্ন না হইলে কেহ তাহা গ্রহণ করিতেন না। কদাচিৎ কেহ মেষ ও মৃগমাংস ভোজন করিতেন। রাজসংসারে যজ্ঞাদি ব্যাপারে মাংসের বাহুল্য ঘটিত। এতদুপলক্ষে হরিণ মাংসও ব্যবহৃত হইত। লুচী বা রুটি বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইত না। ব্রাহ্মণ ও সৎ শূদ্রগণের বিধবারা ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ীগণ মৎস্য মাংস স্পর্শ করিতেন না। হিন্দুশাস্ত্রে নিষিদ্ধ পান ভোজনে আসক্তি নিন্দনীয় ছিল, সিদ্ধি ও গাঁজা ব্যতীত অন্য কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার ছিল না। মদ্যপায়ী অতি ঘৃণার পাত্র ছিল। এই রাজার অধিকারে সুরা বা তাড়ি প্রস্তুতের কঠোর বিধি নিষেধ ছিল।

এই রাজার অধিকার কালে এ প্রদেশে চারুশিল্প ও স্থপতি বিদ্যার সমূহ উন্নতি দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণনগরে তথা সমগ্র নদীয়া প্রদেশে কুম্ভকারগণ মৃত্তিকার মূর্ত্তিগঠনে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করে। পরবর্ত্তী কালে ইহারা সুদূর প্যারিস্, লণ্ডন প্রভৃতি স্থানেও বড় বড় প্রদর্শনীতে মৃণ্ময় পুত্তলিকা পাঠাইয়া যশস্বী হইয়াছে। চিত্রাঙ্কন বিদ্যা বিশেষভাবে আদৃত হইত। মহারাজ স্বয়ং চিত্রাঙ্কণী বিদ্যার একজন সূক্ষ্ম সমালোচক ছিলেন। একবার একজন চিত্রশিল্পী ঋটিকাকাকলীন "স্বভাবের ভাব" বিষয়ক একখানি

---

* অন্নদামঙ্গল পদ্মমুখীর রন্ধন দ্রষ্টব্য।

উৎকৃষ্ট চিত্র অঙ্কন করিয়া রাজসমীপে আনয়ন করিলে রাজা এই চিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া শিল্পীকে তাহার পাথেয় এক সহস্র রৌপ্যমুদ্রা ও তাহার পারিশ্রমিক একটাকা দিতে আদেশ করেন। উপস্থিত ব্যক্তি-মাত্রেই অস্বাভাবিক আদেশে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন "যে শিল্পী উড্ডীয়মান বংশপত্রকে নিম্নমুখী করিয়া চিত্রিত করে তাহার পারিশ্রমিক এক টাকার অধিক দেওয়া অসঙ্গত তবে পাথেয় হিসাবে যাহা দাও সে স্বতন্ত্র কথা। আর একবার মহারাজা তাহার জনৈক পার্ষদকে তাহার প্রবাস যাত্রাকালে কিছু নূতন সামগ্রী আনিতে বলিয়া দেন ঐ পরিষদ প্রত্যাবর্তন কালে রাজাকে দিবার উপযুক্ত কোন নূতন সামগ্রী না দেখিয়া বিষণ্ণ মনে প্রত্যাবর্তন করিতে ছিলেন। পথে একজন কুম্ভকার জাতীয় চিত্রকর তাঁহার বিষাদের হেতু শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ রাজপরিষদের গাত্রস্থ উড়ানী খানি লইয়া নিজ হস্তস্থিত তুলিকা দ্বারা যদিচ্ছা একটী রেখা টানিয়া তাহা রাজাকে একটী নূতন কিছু বলিয়া উপহার দিতে বলেন। পরিষদ ইহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া রাজসমীপে যাইয়া উড়ানীখানি দেখাইয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন করিলে রাজা ঐ উত্তরীয় এবং রেখা পর্য্যালোচনা করিয়া বলিলেন "সত্যই কিছু নূতন দেখিলাম।" সভাস্থ সকলে কারণ জিজ্ঞাসু হইলে তিনি তাহাদের দেখাইলেন যে ঐ চিত্রকর বস্ত্রোপরি "যদিচ্ছা একটী রেখা পাত করিলে ঐ রেখাটী কোন স্থানে মূল সূত্র ছাড়িয়া বস্ত্রের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দ্বিতীয় সূত্র স্পর্শ করে নাই।

শান্তিপুরের মিহি ধুতি ও নক্সা পাড় এই সময়ে জগদ্বিখ্যাত হয় এবং বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া দেশ দেশান্তরে রপ্তানি হইতে আরম্ভ করে। এই সকল মিহি কাপড়ের জন্য সরুসূতা এই পরিবারে প্রধানতঃ দুস্থ ও ভদ্রপরিবারগণ কর্ত্তৃক তকু ও চরকার সাহায্যে নির্ম্মিত

হইত। তাঁহার অধিকার মধ্যে সে সময়ে পিতল, কাঁসা ও লোহা প্রভৃতির ঢালাই কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন হইত। উৎকৃষ্ট অস্ত্রাদি নির্ম্মাণেও কর্ম্মকারগণের বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ পাইত; উৎকৃষ্ট ঢাল, তরবারি, উৎকৃষ্ট খাঁড়া এমন কি কামানাদি প্রস্তুত করিতেও নদীয়ার কর্ম্মকারগণ সুদক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপে নদীয়ার প্রস্তুত একটি কামান মুরশিদাবাদ নবাবের প্রাসাদ প্রাঙ্গণে থাকিয়া অদ্যাপি এই শক্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। *

কামানগাত্রে যে কর্ম্মকার ইহা প্রস্তুত করিয়াছেন, যিনি কুঁদিয়া হরপ লিখিয়াছেন এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যাঁহার আদেশে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে এই তিনজনের নামই ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে। কি সূত্রে এই কামানটী মুরশিদাবাদের নবাব গৃহে স্থান পাইয়াছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা না যাইলেও ইহা নবাব আলিবর্দ্দীকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের উপহার বা এমন কিছু একটা অনুমান করা যাইতে পারে। মহারাজার পূর্ব্বপুরুষ রুদ্রের ন্যায় প্রাসাদাদি নির্ম্মাণে তাহারও বহুযত্ন দেখা যায়। কৃষ্ণনগর রাজভবনে সুবৃহৎ পূজার দালানও শিবনিবাস, গঙ্গাবাস প্রভৃতি স্থানে সুনির্ম্মিত পরম সুদৃশ্য বহু কারুকার্য্যখচিত মন্দিরাবলী এবং শিবনিবাস গঙ্গাবাস হরধাম ও আনন্দধামের প্রাসাদাবলী তাহার জীবন্ত সাক্ষীস্বরূপ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

এই কালে সঙ্গীতের চর্চ্চাও কম ছিল না। যাত্রা, ঢপ্, কীর্ত্তন, কবি, তরজা, ঝুমুর, পাঁচালী, মনসার ভাসান, কালী কীর্ত্তন, শিবকীর্ত্তন, চণ্ডীর গান, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতির সমধিক প্রচলন ছিল। রাজা স্বয়ং একজন সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। কালওয়াদ বিছরাম খাঁর নিকট তিনি যথারীতি সঙ্গীত

* Vide note by Pandit Haraprasad Sastri C. I. E. in the proceedings of the Asiatic Society of Bengal 1893 Page 24—25.

শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাহারই আদেশে সুকবি ভারতচন্দ্র পালাকারে অন্নদামঙ্গল [রচনা করিলে ডাঁউসাই নিবাসী নীলমণি গায়েন্ কর্ত্তৃক উহা মহা সমারোহের অষ্টাহ গীত হয় * সুদাম সুবল নামক এক কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের গানে মুগ্ধ হইয়া মহারাজ শান্তিপুরের সন্নিহিত হরিপুরের চড়ে শতাধিক ভূমি নিষ্কর দান করিয়াছিলেন। ঐ ভূমি অদ্যাপি তাহাদের নামে খ্যাত আছে। পণ্ডিত ও আচার্য্যের ন্যায় দেশ বিদেশ হইতে বহু বাদক ও গায়ক রাজসভায় আসিয়া পুরস্কার লাভ করিত। ঢোল, ঢাক, সানাই, রোশনচৌকি দস্ক বাঁশী, কাড়া, নাগাড়া, নওবৎ প্রভৃতি বাদ্যে রাজবাটী নিত্য মুখরিত রহিত। নওবৎখানায় প্রহরে প্রহরে নওবৎ বাজিয়া সময় ঘোষণা করিত। মুসলমান অধিকারের ফলে সমাজে তোষামদজীবিতা, আত্ম-গোপন ও প্রবঞ্চনাপরতা প্রবেশ করিয়াছিল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কৌশলে তাঁহার পিতৃব্যের অধিকার নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণও এ বিষয়ে অপটু ছিলেন না। তাঁহার পুত্র শম্ভুচন্দ্র একবার তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহার মৃত্যু রটনা করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। এই সময়েই রাজা রাজবল্লভ তাঁহার বিধবা কন্যার পুনর্ব্বিবাহ দিবার চেষ্টা করেন কিন্তু নদীয়াধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কৌশলে উহা ব্যর্থ করেন।

---

* কৃষ্ণচন্দ্র আমার আজ্ঞানুসারে।
রায় গুণাকর নাম দিবেক তাহারে॥
সেই এই অষ্টমঙ্গলের অনুসারে।
অষ্টাহ মঙ্গল প্রকাশিবেক সংসারে॥
ডাঁউশাঁই নীলমণি কণ্ঠে আভরণ।
এই মঙ্গলের হবে প্রথম গায়ন॥

অন্নদামঙ্গল।

রাজসভায় তখন ধর্ম্মসংক্রান্ত পুস্তকাপেক্ষা বিদ্যাসুন্দরের আদর অধিক ছিল এবং সাধরণ লোকেরও রামায়ণ বা চণ্ডীর গান অপেক্ষা "খেউড়ে" অনুরক্তি দেখা যাইত।

এই সময়ে পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েই পরিচ্ছদে মুসলমানী ভাব প্রবেশ করিয়াছিল। পুরুষে বাটীতে সর্ব্বদা ধুতি ও গামছা (দোসুতী) ব্যবহার করিলেও কোনও উৎসব বা রাজদরবারে যাইতে হইলেই "আবা" "কোবা" "চোগা" "জোব্বা" প্রভৃতিতে দেহযষ্টী আবৃত করিতেন। "চাপ-কান" মচকান্" চুড়ীদার পায়জামা, পায়ে লকাদার জুতা সৌখীনতার পরিচয় দিত।

পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেও মুসলমানগণের অনুকরণে নানাপ্রকার রৌপ্য ও সুবর্ণনির্ম্মিত অলঙ্কারাদি পরিধান করিতে আরম্ভ করেন। অলঙ্কারে হীরা মুক্তা ব্যবহারের প্রথা এই সময়ে প্রবর্ত্তিত হয়। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অন্তঃপুরবাসিনীরা সক্ করিয়া পেশোয়াজ ইত্যাদি পরিতেন। জাঁক জমকের সহিত বারইয়ারী পূজার সৃষ্টিও এই কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। মহারাজা স্বয়ং এই পূজার প্রধান পাণ্ডা ছিলেন। বারইয়ারীতলার উৎসবমণ্ডপ দেবদারু পাতায় কদলী বৃক্ষে পূর্ণকুম্ভে ও রচনার ফলে সুসজ্জিত হইত; কাঁদি সমেত রম্ভা, কাঁদি সমেত ডাব, শাখা সহিত বাতাবী লেবু ও অন্য ফল পূজাগৃহে ঝুলাইয়া দেওয়া হইত উহারাই নাম "রচনা" চণ্ডীমণ্ডপ নানারূপে বিচিত্র "আলিপনায়" চিত্রিত করা হইত। রাত্রে সর্ষপ ও রেঢ়ীর তৈলের তরবেতর আলোক দেওয়া হইত। ও সকলে প্রাণ খুলিয়া আমোদ করিতেন। এমনি করিয়া হাসিমুখে সকলে দিন যাপন করিতেন।

সম্পূর্ণ।